

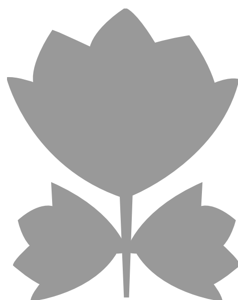
হযরত মোজ্জাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ)

মাআরিফে লাদুন্নিয়া

মাআরিফে লাদুন্নিয়া

মূলঃ হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র.

অনুবাদঃ ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক



হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

মাআরিফে লাদুন্নিয়া

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.
এর বিখ্যাত রেসালা

অনুবাদ
ড. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

প্রথম প্রকাশঃ শাওয়াল ১৪০৫ হিজরী
৬ষ্ঠ প্রকাশ ঃ জমাদিউস্ সানি ১৪৩0 হিজরী

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন- ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

বিনিময়
সত্তর টাকা মাত্র

MA ARIF-E-LADUNNIA: A collection of spiritual description written by Hazrat Mozaddede Alfe Sani R. and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Taka seventy only U.S. $ 10.00

ISBN 984-70240-0022-4

আমাদের প্রকাশিত বই

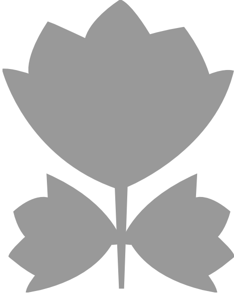
তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহা প্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা



যে সুরার খরস্রোতে আমার স্বাক্ষর রাখিলাম
প্রাণোচ্ছল গতি তার সময়ের উষর প্রান্তরে
কখনো মানে না মানা, ভোলেনা সে সমুদ্রের নাম,
যে নেশায় করণির পথ রুদ্ধ হয়নি পাথারে
হৃদয়ের দীপাগ্নিতে দেখেছে প্রমত্ত দুর্ণিবার
মাশুকের মুখচ্ছবি; দেখেছে আপন মাহবুব;
প্রতি মুহূর্তের স্রোতে পড়েছে উজ্জ্বল ছায়া যার;
ভাবের অলক্ষ্য লোক বিস্ময়ে দেখিছে সেই রূপ।

মুসার পূর্ণতা তার পথ প্রান্তে, -ঈসার নিঃসীম
ধ্যান মূর্তি! দেখেছে সে জিজ্ঞাসার বেলা
খিজিরের দৃষ্টি দিয়ে; পথে যার নবী ইব্রাহিম
জ্বেলেছে তৌহিদী শিখা! যে নিঃসঙ্গ সম্পূর্ণ একেলা
ইমানের পূর্ণ স্রোতে নিয়ে এলো পাথেয় অসীম
যে পাথেয় নিয়ে আজও চলিয়াছে অসংখ্য কাফেলা।

—ফররুখ আহমদ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহ্‌পাক ব্যতিরেকে অন্য কোনো তরফ থেকে কোনো শক্তিও নাই কোনো সাহায্যও নাই। সেই পাক জাতের জন্যই আদি ও অন্তের যাবতীয় প্রশংসা, যিনি তাঁর অনুগত বান্দাগণকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন। যাবতীয় প্রকারের উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী মোহাম্মদ স. এবং হেদায়েতের নক্ষত্র সদৃশ সাহাবীবৃন্দ এবং নূহ আ. এর কিশতী তুল্য তাঁর পবিত্র বংশধর ও পরিবার পরিজনদের প্রতি। আমিন।

ষষ্ঠবারের মতো প্রকাশিত হলো মাআরিফে লাদুন্নিয়া। মারেফতের পথানুসন্ধানীগণের জন্য ইহা জ্যোতির্ময় দলিল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক শায়েখ আহাম্মদ ফারুকী সেরহিন্দী র. রচিত এই অমূল্য গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় রূপান্তর নিঃসন্দেহে সাধনাসাপেক্ষ ব্যাপার। যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আন্তরিকতা ও মহব্বতের প্রবল তাগিদে বাংলাভাষাভাষীদের সামনে মাআরিফে লাদুন্নিয়া পেশ করার আবেগ আমরা সংবরণ করতে পারিনি। নিশ্চয়ই আমাদের নামাজ, যাবতীয় সৎকর্ম, আমাদের জীবন ও মৃত্যু বিশ্বসমূহের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের জন্যই।

পৃথিবী জ্বলছে। আত্মহননের আগুনে পুড়ছে ঘর বাহির সর্বত্র। সত্য দ্বীন বিরোধীরাই শুধু নয়— দ্বীনদারীর ছদ্মাবরণে তথাকথিত কিছু মুসলমান নামধারীরাও দ্বীন ধ্বংসের সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছে বহিরাশ্রয়ী, জড়বাদ প্রভাবিত। ফলে শত সহস্র শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ফেৎনার বিষবৃক্ষ। ফাসেক শাসকগোষ্ঠীর সহায়তা করছে দুনিয়াদার আলেমগণ। ভ্রষ্টআকিদা সম্পন্ন লোকেরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নামে শুরু করেছে অবাঞ্ছিত আস্ফালন। ভণ্ডপীর দরবেশরা সেজেছে রূহানী নেতৃত্বের দাবীদার।

সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ্‌পাকই। আমরা তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌পাক সকল প্রকার বেদাতীদের অপচেষ্টা প্রতিহত করুন, সকলকে তওবা নসিব করুন এবং সবাইকে সত্য দ্বীনের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন। আমিন।

সত্য দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম শর্তঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-রমণীগণকে নিজেদের আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তঃ শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ হতে হবে। আল্লাহ্পাকের এরশাদও এরকমই, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা ইসলামের প্রতি পূর্ণরূপে সমর্পিত হও।'

একথাও মনে রাখতে হবে যে, এলেম, আমল এবং এখলাস এই তিনটির সমন্বয়ই পূর্ণ শরীয়ত। এলেম অর্থ দ্বীনের এলেম। যেমন হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় এলেম অর্জনের পর তা আমলও করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এলেম ও আমলের প্রাণ এখলাসও অর্জন করতে হবে।

এখলাস অর্থ বিশুদ্ধ নিয়ত। নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে এলেম ও আমলের পরিমাণ গগনচুম্বী হলেও সবকিছু নিষ্ফল হতে বাধ্য। নিয়তের উৎপত্তিস্থল কলব (অন্তর)। অন্তর বিশুদ্ধ না হলে নিয়ত বিশুদ্ধ হতেই পারে না। আর নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে আমলও বিশুদ্ধ হয় না। আমল বিশুদ্ধ না হলে আল্লাহ্পাক তা কবুলও করেন না।

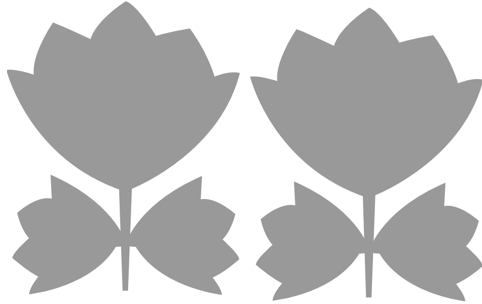
আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'সাবধান হও। আল্লাহ্পাকের জন্য বিশুদ্ধ দ্বীন হওয়া চাই।' রসুলেপাক স. বলেন, 'তোমাদের শরীরে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে। ঐ মাংসপিণ্ডটি শুদ্ধ হলে তোমাদের শরীর শুদ্ধ হয়– না হলে শরীর অশুদ্ধ থাকে। জেনে রাখো, তা হচ্ছে কলব।' শয়তান এই কলবে তার আবাস নির্মাণ করে বলেই কলব অশুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যায়। আর কলবে আল্লাহ্পাকের জিকির জারী হলে শয়তান কলব ছেড়ে পালিয়ে যায়। হাদিস শরীফে একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে।

আমাদের কলব আল্লাহ্র জিকিরে জিন্দা করতে হবে। আর এজন্যই জিকিরময় কলবের অধিকারী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আমাদেরকে সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে। বিভিন্ন তরিকার পীর মাশায়েখগণ এই খেদমতেরই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই তাঁদের নিকট বায়াত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো গত্যন্তরই নেই। যাবতীয় তরিকার মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক তরিকা হচ্ছে, খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকা। এই তরিকার কামেল মোকাম্মেল মোর্শেদের নিকট বায়াত হলে সর্বনিম্ন সময়সীমা মুরিদ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিনের মধ্যে কলবে জিকির জারী হয়। ইহা আল্লাহ্পাকের ফজল। আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। আমরা এই সুউচ্চ তরিকায় দাখেল হবার জন্য আমাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহের মাধ্যমে বার বার দাওয়াত জানিয়েই যাচ্ছি। এবারও জানাচ্ছি। সংবাদ পৌঁছানো ছাড়া বাহকের আর কিইবা দায়িত্ব থাকতে পারে?

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

“ হে আল্লাহ্! আমাকে মুসলমান
হিসাবে মৃত্যু দাও এবং তোমার
সৎবান্দাগণের সঙ্গী করিয়া লও।”



(৭৮৬)

খুত্‌বাহ্‌

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের জন্য, আর আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মানিত বান্দাদের উপর সালাম। খাস করে আল্লাহ্‌পাকের সম্মানিত রসুল আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম ঃ যাঁহাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা সমস্ত মখলুকাতের প্রতি রসুল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আর তাঁহার বংশধর ও সাহাবীদের উপর, যাঁহারা নেককার এবং পরহেজগার- দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁহাদের উপর সালাম ও দরূদ। হাম্‌দ ও সালাতের পর বক্তব্য এই যে, ইহা ঐ এলহামী এলেম এবং এলমে লাদুন্নীর মারেফাত, যাহাকে আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীনের রহমতের ভিখারী ও সম্মানিত বান্দা আহমদ ইবনে আব্দুল আহাদ ফারুকী নকশবন্দী র. লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় রহমতের দ্বারা তাঁহাকে অনুগৃহীত করুন এবং তাঁহার আকাংখা পূরণ করুন। আমিন।



আল্লাহ্‌ (الله) শব্দের মধ্যে হরূফে তারিফের[১] সম্বন্ধ স্থাপনের হেকমত সম্পর্কেঃ ‘আল্লাহ্‌’ পবিত্র শব্দটি ‘আলিফ’, ‘লাম’, ও ‘হু’— এই তিনটি হরূফে তারিফের সমন্বয়ে গঠিত। আর এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে ‘যাতে ওয়াজেবুল্‌ ওজুদ’ সুলতানুহুর নাম (আল্লাহ্‌) গঠিত হইয়াছে।

[১] নির্দিষ্ট সূচক অক্ষরের।

বস্তুতঃ এই পবিত্র ইসমের (নামের) মধ্যে তিন ধরনের সুনির্দিষ্ট অর্থ একত্রিত হইয়াছে। যদিও উহার প্রত্যেকটি অর্থই পরিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করে। কিন্তু এখানে তিনটি অর্থ একত্রিত হওয়ার কারণে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই মহৎ নামের মালিক আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুকে পূর্ণ মহত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার কারণে কোনপ্রকারেই চেনা জানা যায় না এবং কোনভাবেই তাঁহার পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয় না। কেননা, যদি তাঁহার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইত, তবে একটি সুনির্দিষ্ট শব্দ তাঁহার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট হইত। কেননা, কার্যকারণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অধিক অর্থ সম্ভারের কোন প্রয়োজন-ই নাই। বরং একটি কারণ প্রাপ্তিতেই উহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ কারণসমূহ যখন উহার অবস্থাসমূহের কোন একটি অভিব্যক্তির কারণেও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম নয়, তখন উহা দ্বারা ইহাই বোঝা যায় যে, এই দুইয়ের (নাম ও নামধারীর) মধ্যে কারণ ও অর্থগত কোন সম্পর্কই নাই।

কাজেই আল্লাহ্তায়ালা সম্পর্কে যখন প্রশংসিত বিষয়ের অর্থ প্রকাশের কোন অবকাশ নাই, তখন আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়ালার পরিচয় প্রাপ্তি ও অনুভূতি লাভ অসম্ভব। বস্তুতঃ ঐ পবিত্র দরবার পর্যন্ত কোন জ্ঞান পৌঁছিতে পারে না। আর তাঁহার পরিচয় প্রমাণ সাপেক্ষে প্রমাণিত হয় না। কারণ, হক তায়ালার যাত উহা হইতে অনেক সমুন্নত, যাহাকে অনুভব করা যায় এবং উহা হইতে অনেক বড়, যাহাকে জানা যায়; আর উহা হইতে অনেক সম্মানিত, যাহার পরিচয় লাভ করা যায়।

এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জানা গেল যে, এই পবিত্র নামটি (الله), আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অন্যান্য নাম হইতে স্বতন্ত্র। আর অন্যান্য নামের জন্য যে নির্দেশ, ইহা ঐ সমস্ত নির্দেশ বহির্ভূত। কাজেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই নামটি হক তায়ালার পবিত্র দরবারের জন্য সর্বাধিক উপযোগী।

এখানে এইরূপ প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, যখন এই পাক নাম (الله) উহার মালিকের পরিচয় বহন করে না, তখন এইরূপ নামকরণের স্বার্থকতা কি?

এই প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, নামের জন্য এই শব্দটিকে নির্ধারিত করার উদ্দেশ্য হইল এই যে, যে পবিত্র যাতের নাম ইহার সহিত রাখা হইয়াছে, এই নামটি তাঁহাকে তাঁহার অন্যান্য নাম হইতে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। এতদসত্ত্বেও ব্যাপারটি এইরূপ নয় যে, উহার দ্বারা ঐ নামধারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব। বস্তুতঃ এই মোবারক-নাম এবং অন্যান্য নামের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য এই যে, ঐ নামগুলি দ্বারা উহার স্বত্ত্বাধিকারীর পরিচয় লাভ করা যায়। আর এই

বিশেষ নামটি (الله) তাঁহাকে তাঁহার অন্যান্য নাম হইতে স্বতন্ত্রতা দান করে। আর এই পবিত্র নামধারীর পরিচয় তো জানাই যায় না। বরং উহা স্বীয় মালিককে অনন্য অবস্থা প্রদান করে। অর্থাৎ মালিকের জ্ঞান লাভ তো সম্ভব-ই নয়। কিন্তু অন্য সমস্ত নামে, উহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।



পরিচয় প্রদানে নির্দিষ্টকারী বর্ণ ব্যবহারের কারণঃ 'আলিফ' ও 'লাম' ব্যবহারের কারণে অনির্দিষ্ট নাম সুনির্দিষ্ট নামে পরিণত হয়। কেননা, এই উচ্চ প্রশংসার প্রেক্ষিতে উহার পরিচয় প্রকাশিত হয়। এই পবিত্র নাম (الله) আলিফ ও লাম পরিচয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। আর 'হু' হইল উহার সর্বনাম। যেমন কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালার নাম হইল কেবল মাত্র 'হু', যাহার অর্থ হইল অদৃশ্য সত্তা এবং আলিফ ও লাম অক্ষরদ্বয় নির্দিষ্টকারী মাত্র।

বস্তুতঃ এই নির্দিষ্টকারী বর্ণ দ্বারা উহার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে যে, ইশারাকৃত অস্তিত্বকে নির্দিষ্ট করিবার জন্য কেবলমাত্র সর্বনাম ব্যবহারের দ্বারা পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয় এবং অতিরিক্ত নির্দিষ্টকারী বর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন; আর উহা হইল আলিফ ও লাম। আর লাম হরফের উপর তাশ্দীদ (দ্বিত্বচিহ্ন) অধিক নির্দিষ্ট বুঝাইবার জন্য আনা হইয়াছে। আর যখন অতিরিক্ত নির্দিষ্টতা প্রকাশক হরফের দ্বারাও নামধারীর পরিচয় প্রদানের উপযুক্ত অবস্থা অর্জিত হয় নাই, তখন উহার সম্মিলিত রূপকে যাতে হকের নাম হিসাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে। যাহাতে তাঁহার যাতের পরিচয় লাভ করা যায়। অবশ্য ইহার দ্বারাও এমন কিছু অর্জিত হয় নাই, যাহার সাহায্যে যাতে হককে প্রকৃত অর্থে সনাক্ত করা যায়। বেশী থেকে বেশী ইহাই অর্জিত হইয়াছে যে, গায়রুল্লাহ্ হইতে এই পবিত্র নামের এক ধরনের পার্থক্য হাসিল হইয়াছে। কাজেই পবিত্র সেই যাত, যিনি তাঁহার পরিচয় অন্বেষণকারীদের সামনে অক্ষমতা ব্যতীত অন্য কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই।



মারেফত তিন

এই পবিত্র যাতী নামটি (আল্লাহ্) দুই ধরনের নির্দিষ্টজ্ঞাপক অক্ষর দ্বারা সংগঠিত হওয়ায় এই ইংগিত বহন করে যে, উহা পরিপূর্ণ মহত্ত্বের অধিকারী এবং জ্ঞান ও বিবেকের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। তাই, নামধারী নির্ধারণে কেবলমাত্র সত্তাজাত নাম হওয়াই যথেষ্ট নয়। কাজেই উহার নির্ধারণে কয়েকটি কারণের প্রয়োজন হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও উহাকে আদৌ জানা ও চেনা যায় নাই।



মারেফত চার

হরূফে-তারিফের আধিক্যের কারণ সম্পর্কেঃ যদিও পরিচিতির জন্য নির্দিষ্ট প্রকাশক বর্ণের আধিক্য প্রয়োগ আদৌ জরুরী নয়, যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে; আর এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্টসূচক বর্ণইতো যথেষ্ট। এতদসত্ত্বেও অধিক হরূফে-তারিফ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, উহার নামধারী অপ্রকাশ্য এবং অজ্ঞাত। আর তিনি হইলেন ‘হক সুব্হানাহু তায়ালা’— যিনি আমাদের অনুভূতি হইতে অনেক দূরে এবং অনেক ঊর্ধ্বে।



সম্ভাব্য বস্তুর অস্তিত্ব এবং উহার তত্ত্ব সম্পর্কেঃ হক সুব্হানুহু তায়ালা তাঁহার মাহাত্ম্যকে, যাহা তাঁহার যাতের অনুরূপ বাহিরে এককত্বের ভিন্ন-ভিন্নরূপে বিদ্যমান। আর এলেমের দাবী এই যে, উহার দ্বারা লব্ধজ্ঞান একটি অপরটি হইতে ভিন্ন হইবে। বস্তুতঃ ঐ মাহাত্ম্য (শূয়ূনাত) এলেমের জগতে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক মহৎ আচরণ (শান), একটি অপরটি হইতে পৃথক। আর প্রত্যেক শান, বিশেষ পার্থক্য ও আলাদা ব্যক্তিদের দাবীদার। প্রকৃতপক্ষে, এলেমের জগতে এই পার্থক্যপ্রাপ্তি শূয়ূনাত্-মুমকিনাত্ হিসাবে পরিচিত। কেননা, মুমকিন উহাকে বলা হয়, যাহাতে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই বিদ্যমান। আর ঐ শূয়ূনাতের অবস্থাও তথৈবচঃ। কেননা উহাও অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে সেতু স্বরূপ। স্বীয় সত্তার প্রতি সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও উহার গতি অস্তিত্বের দিকে হইয়া থাকে। কেননা বাহিরে শূয়ূন-যাতেরই অনুরূপ এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের সহিত সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও উহার গতি অস্তিত্বহীনতার দিকে। কেননা, ওজুদের (অস্তিত্ব) পার্থক্য আদম (অনস্তিত্ব) দ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন কোন কবির ভাষায়ঃ .....

প্রতি বস্তু যায় চেনা, তার বিপরীত দিয়ে।

আর এই আকৃতিগত জ্ঞানের বাহিরে আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই এবং উহা এলেমের জগতের বাহিরেও আসে নাই। বরং হক-সুবহানুহ তায়ালাকে উহার নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাবলী দ্বারা বাহিরে জানা যায়। বস্তুতঃ এই আকৃতি কেবলমাত্র জ্ঞানের মধ্যেই মওজুদ থাকে। অবশ্য উহার নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাদি বাহিরে পাওয়া যায়। কিন্তু এই নিদর্শনাবলী ও নির্দেশাদি, বাহিরে হক তায়ালার যাতের সত্তার অনুরূপ। কেননা, বাহিরে একক অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোন কিছুই নাই। কাজেই যাতের অনুরূপ হওয়ার দিক দিয়ে নিছক প্রকাশ্য অবস্থা শুধুমাত্র অস্তিত্বের জন্য এবং ক্রমোন্নতির দৃষ্টিতেও প্রকাশ্য অবস্থাই প্রকৃত উদ্দেশ্য মাত্র।

বস্তুতঃ ঐ সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু যাহার আকৃতি প্রকাশ্যে অস্তিত্ববান আছে, ইহা কেবলমাত্র একটি ধারণা বৈ কিছুই নয় এবং উহা একটি ভুল ধারণা। যেমন, কাশফের অধিকারী ব্যক্তিদের দর্শন ক্ষমতা সাক্ষ্য প্রদান করে। আর তাঁহাদের এইরূপ ধারণার কারণ এই যে, হক সুবহানুহু তায়ালা স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা এই সমস্ত মুর্ত জ্ঞানের বাহিরের অস্তিত্বের সহিত এইরূপ সম্পর্ক প্রদান করিয়াছেন, যাহার অবস্থা জ্ঞাতব্য নয়। আর সৃষ্টবস্তুর উদ্দেশ্য হইল, ঐ সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রদান করা। আর এই সম্পর্কই বাহিরে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণ হইয়া গিয়াছে। যেমন কোন এক ব্যক্তির অবয়বের সম্পর্ক ঐ আয়নার সহিত হইয়া যায়, যাহা তাঁহার সম্মুখে থাকে; ফলে ঐ আয়না সেই ব্যক্তির সূরত দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপার এই যে, আয়নায় তো কোন কিছুরই সুরত থাকে না, বরং উহা তো স্বীয় রঙবিহীন, স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে। বস্তুতঃ হক-সুবহানুহ তায়ালা এখনও ঐরূপেই মওজুদ আছেন, যেমন ছিলেন আদিতে এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুরই সংস্রব নাই।



মারেফত ছয়

সালিকের আত্মিক ভ্রমণের প্রকার ও স্তরঃ শানসমূহের স্তরে একটি অপরটি হইতে ভিন্ন হওয়া ব্যতিরেকে আর কোন রং গৃহীত হয় নাই। আর বাহিরে তন্মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, উহা তাহার বাহ্যিক কারণ ও নির্দেশাদির ফলশ্রুতি মাত্র। এই কারণেই সালিক যখন স্বীয় নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছায়, আর সেই অবস্থা তাঁহার নিকট প্রকাশ পায়, তখন সে উহার মধ্যে বাহ্যিক আকৃতির কিছুই পায় না এবং সেই নির্দিষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য কোনকিছুই তাঁহার উপর প্রকাশ পায় না। যদি এই পরস্পর পার্থক্য হওয়া ব্যতীত, দ্বিতীয় কোন রঙ উহার মধ্যে অবশিষ্ট থাকিত; তবে উহা প্রকাশ পাইত এবং উহার যে প্রশস্ততা দৃষ্টিগোচর হয়, উহা এ কারণে যে, উহা কয়েকটি শানের সম্মিলিত রূপ এবং উহার বৃত্তাকৃতি হওয়ার কারণ এই যে, বস্তুর অবিমিশ্র বা প্রাথমিক অবস্থা বৃত্তাকৃতিই হইয়া থাকে।

আর কোন কোন মাশায়েখগণ র. এইরূপ বলেন যে, সালিকের সায়েরের (আত্মিক ভ্রমণের) শেষ প্রান্ত হইল ঐ এসেম (নাম), যাহা তাঁহার জন্য নির্ধারিত মূল। ইহার অর্থ এই যে, উহার সায়েরের শেষ প্রান্ত হইল, তাঁহার আয়নে ছাবিতা (প্রকৃত স্থান) আর উহার নির্ধারিত মূলের অর্থ হইল— উহার বাহ্যিক পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের সূচনাই হইল উহার আয়নে ছাবিতা। ইহার অর্থ এই নয় যে, নির্ধারণের অর্থ জ্ঞানগত সূচনা যাহা শানে ইলাহী (আল্লাহ্র শান)। কেননা, শান বাহিরে যাতের (সত্তার) মতো হয় এবং উহা যাত হইতে পৃথক হয় না, যদ্বারা উহা কোন জিনিসের প্রারম্ভ হইতে পারে এবং সায়ের সেখানেই শেষ হইতে পারে।

আর আয়নে ছাবিতা পর্যন্ত পৌঁছানোর পর উহার সায়ের ঐ আয়নে ছাবিতার মধ্যেই হইয়া থাকে। কেননা উহা এত অসংখ্য শূয়ূনাতের (শানসমূহের) সম্মিলিতরূপ যে, যাহার কোন পরিসীমা নাই। সূফীয়ায়ে কিরামদের পরিভাষায় এই সায়েরকে "সায়েরে ফিল্লাহ" বলা হয়। কেননা, উহার ইলমী-তায়য়উন (জ্ঞানগত সূচনা) এমন একটি তায়য়উন, যাহা "মরতবায়ে জমাআর" (সম্মিলিত রূপের) মধ্যে পাওয়া যায়। আর উহা যে সিফাতের (গুণাবলীর) অধিকারী উহা হইল সিফাতে ইলাহী (আল্লাহর গুণাবলী), সিফাতে কাওনী (সৃষ্টির গুণাবলী) নয়। কাজেই, এই সায়ের প্রকৃতপক্ষে "সায়েরে ফিল্লাহ"ই হইয়া থাকে। কেননা, "আল্লাহ্" শব্দের অর্থই হইল যাত ও সিফাতের (সত্তা ও গুণাবলীর) সম্মিলিতরূপ, কেবলমাত্র একক যাত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালার শানসমূহ যখন এলেমের গৃহে পার্থক্যের রং অর্জন করিয়াছে, তখন তাঁহার কারণে উহা অনস্তিত্ব ও অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্যকারী হইয়া গিয়াছে। কাজেই "সায়ের ফিল আশিয়া" (বস্তুর মধ্যে ভ্রমণ)কে যদি "সায়ের দর আলম" (সৃষ্টি জগতের মধ্যে ভ্রমণ) বলা হয়, তবে ইহ্াও সঠিক হইবে। এ জন্যই সুফীয়ায়ে কেরামগণ বলেন, শেষ-বিন্দু পর্যন্ত ভ্রমণ লাভ হওয়ার পর, আবার প্রথম বিন্দুর দিকে প্রত্যাবর্তন সাধিত হয়। আর এই সায়েরকে সূফীদের পরিভাষায় "সায়ের ফিল-আশিয়া বিল্লাহ" বলা হয়।

বস্তুতঃ সূফীগণ যাহাকে "সায়েরে ফিল্লাহ্" বলেন, উহা প্রকৃতপক্ষে আশেকের মধ্যে মাশুকের সায়ের মাত্র এবং ইহার অর্থ এই যে, আশেকের যে সমস্ত গুণাবলী ও কর্মাদি হাসিল ছিল, সে উহার সবই মাশুককে দেয় এবং নিজেকে সম্পূর্ণ শূন্য করিয়া ফেলে। অতঃপর তদ্বারা সে যে কাজ সম্পন্ন করে, উহার সম্পর্ক তাঁহার নিজের প্রতি হইবে না, বরং মাশুকের প্রতি-ই হইবে। আর এ কারণেই সায়েরের নেসবত (সম্পর্ক) তাহার প্রতি-ই হইবে। এমতাবস্থয় আশেকের অস্তিত্ব এমন একটি স্থানে, যাহা কিছুই নয়। কাজেই, বাস্তবে ঐ সায়ের "আশেকের মধ্যে মাশুকের" সায়ের মাত্র।



মাকামে-তাকমীল (পূর্ণতার স্তর) এবং তাশ্‌বীহ্‌[১] ও তান্‌যীহের[২] একত্রিকরণঃ ঐ তাশ্‌বীহ্‌ যাহা তান্‌যীহের পর প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা তাঁহার আয়নে-ছাবিতারই নির্ধারিত রূপ। আর যে তাশ্‌বীহ তান্‌যীহের সহিত একত্রিত হয়, উহা ঐ তাশ্‌বীহ যাহা মরতবায়ে-জমাআর (সম্মিলিত রূপের) সহিত সম্পর্কিত। আর যে তাশ্‌বীহ্‌ তান্‌যীহের প্রকাশের আগে প্রকাশ পায় এবং মরতবায়ে-ফরক (বিচ্ছিন্ন রূপ) এর সহিত সম্পর্ক রাখে; উহা তান্‌যীহের প্রকাশের সময় বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তন্মধ্যে তান্‌যীহের সহিত একত্রিত হওয়ার যোগ্যতা থাকে না।

বস্তুতঃ তাশ্‌বীহ্‌ ও তান্‌যীহের একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ইদরাকে বাসীত (অবিমিশ্র অনুভূতি) যাহা হইল তান্‌যীহ্‌, উহা সিফাতে ইলাহীয়ার (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) পর্দায় অবতরণের পর তাশ্‌বীহ্‌ রূপে বোধগম্য হয় এবং উহা ইদরাকে-মুরাক্কাব (মিশ্র অনুভূতির) এর রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই, মাকামে তাকমীল তাশবীহ ও তান্‌যীহের সম্মিলিতরূপ মাত্র। কেননা, তান্‌যীহের অধিকারী ব্যক্তি এ ব্যাপারে সক্ষম নয় যে, সে স্বীয় অনুভূতি শক্তির মধ্যে যাতকে হাজির করিতে পারে। কেননা, যাতের জ্ঞান ঐ সিফাতে-ইলাহীয়ার পর্দার জ্ঞান ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না, যাহার উপর আয়নে-ছাবিতা স্থাপিত। আর আয়নে ছাবিতার (নির্ধারিত রূপের) প্রকাশ তাঁহার উপর আদৌ সংঘটিত হয় নাই। কাজেই, সেই ব্যক্তি, যে নিজে আসল জ্ঞান লাভে সক্ষম হয় নাই, সে কীভাবে অন্যকে সেই জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে? আর মূল উদ্দেশ্যকে সিফাতে কাওনীয়ার (সৃষ্ট গুণাবলীর) পর্দায় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সিফাতে-কাওনীয়াতে এই ক্ষমতা নাই, যাহা উহার জন্য দর্পন স্বরূপ হইতে পারে। যেমন কথায় আছে, বাদশাহের দানকে শাহী যানবাহন-ই উঠাইতে সক্ষম।

---

১. সাদৃশ্য প্রতিপাদন; ২. পবিত্র গুণ বা সত্ত্বা।

"ফানাফিল্লাহ" (আল্লাহ্তে বিলীন হওয়া) ঐ ব্যক্তির-ই লাভ হইয়া থাকে, যে নিজের অস্তিত্বের অণু-পরমাণুকে সমস্ত বস্তুর আয়না মনে করে এবং উহাতে সমস্ত বস্তুকে দর্শন করে এবং তাহার প্রতিটি অনু-পরমাণু সমস্ত বস্তুর রং-এ রঞ্জিত হয়। কেননা, যাতে-ইলাহীয়ার মরতবায় (আল্লাহর সত্তার স্তরে) প্রতিটি শান, যাহা ফানাফিল্লায় গ্রহণীয়, সমস্ত শুয়ূনাতের (শানসমূহের) সম্মিলিত রূপ স্বরূপ। কেননা, উহা যাত হইতে পৃথক নয়। কাজেই যাত দ্বারা উহার সবকিছুকে বোঝা যায়, একইভাবে শান দ্বারা উহার সম্মিলিত রূপকেই জানা যায়। এমতাবস্থায়, সালিক (আধ্যাত্মিক পথ-পরিভ্রমণকারী) স্বীয় দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণুকে, শান জগতের সহিত ফানা করিয়া দেয় এবং সে প্রতিটি অণু-পরমাণুর বদলে শূয়ূনে-ইলাহীয়ার (আল্লাহ্র শানসমূহের) মধ্য হইতে কোন একটি শানকে মওজুদ পায়, যদিও সে উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত নাও হইতে পারে। কাজেই যতক্ষণ না তাঁহার দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণু একত্রিতকরণের গুণে গুণান্বিত হয়, ততক্ষণ সে ফানার যোগ্যতা হাসিল করিতে সক্ষম হয় না। আর কিছু লোক এমনও হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের দুর্বল অনুভূতি শক্তির কারণে নিজের অণু-পরমাণুর অনুভূতি সম্পর্কে কিছুই বুঝিতে পারে না। যদিও তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এই যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে এবং ফানাফিল্লাহ্র দরজা লাভে ধন্য হয়। আর ইহাও জরুরী নয় যে, যদি কেহ নিজের অণু-পরমাণুর অনুভূতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়, তবে সে অবশ্যই ফানা লাভ করিবে। বরং ইহা মহান আল্লাহর-ই অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী।



মারেফত আট

<u>অহদাতে-যাতী (একক যাত), সিফাতী ও আফআলীঃ</u> হক সুবহানুহ তায়ালার ফেল ও সিফাত (কার্যকলাপ ও গুণাবলী), তাঁহার যাতের মতই অমুখাপেক্ষী; যন্মধ্যে আধিক্যের কোন স্থান নাই। বাস্তব কথা এই যে, হক তায়ালার যাত এমন অনেক বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত, যাহার একটি অপরটির সহিত মিলিত। এই জন্য তাঁহার ফেল, সিফাতও উহার সহিত সম্পর্কিত। কেননা, এই দুইটি বিষয় বাহিরে

যাতের অনুরূপ। কাজেই হক-তায়ালার যাত যেমন বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখার কারণে, যাতের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, একইরূপে ফে'ল্ ও সিফাত উহার সহিত সম্পর্ক রাখার কারণে বহু বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়ঃ হক সুবহানুহু তায়ালার ফে'ল, যাহা আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন, আল কুরআনের ভাষায় 'অমা আমরুনা ইল্লা অহিদাতুন্ কা-লামহিম বিল বাসার' (৫৪ঃ৫০) অর্থাৎ আমার নির্দেশ কেবল একই, যেমন চোখের পলক। কিন্তু এই কাজের সম্পর্ক কয়েকটি বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত। কাজেই, ঐ কাজটি কয়েকটি কাজ হিসাবে মনে হয়। আর হক তায়ালার যাত যেমন বিভিন্নধর্মী বিষয়ের একত্রিতকারী, তেমনি তাঁহার ফে'ল ও সিফাত বিভিন্নপ্রকার বিষয়ের সমন্বয়কারী। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কাজেই, সেই কাজটি কোথাও জীবনদানকারী হিসাবে এবং কোথাও মৃত্যুপ্রদানকারী হিসাবে প্রকাশ পায়। আর কোথাও সেই কাজকে সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং কোথাও শাস্তি প্রদান ও বদলা গ্রহণ হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

একইরূপে "কালাম" (বাক্য) যাহা হক-তায়ালা সুবহানুহুর সিফাত; উহাও অমুখাপেক্ষী এবং তিনি আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত এই কথার সহিত কথোপকথনকারী। কেননা, বোবা অথবা নিশ্চুপ হওয়া সেই পবিত্র যাতের জন্য জায়েজ নয়। আর ঐ একটি কথা, বিভিন্ন অবস্থার সহিত সম্পর্কিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন কথা এবং বিভিন্ন সময়ের অনুরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। কখনও উহাকে আমর (হুকুম) বলা হয়, কখনও নেহী (নিষেধাজ্ঞা) এবং কখনও ইসম (বিশেষ্য) আর কখনও হরফ (অব্যয়) বলা হয়। এভাবে অন্যগুলির ধারণা করা যায়।

আর আলেমগণ যাহা বলিয়াছেন, হক-তায়ালার উপর যামানার হুকুম-আহকাম জারী হয় না, উহার সূরত হইল এইরূপ। কেননা, হক-তায়ালা সুব্হানুহুর সম্মুখে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একই মুহূর্তে সবই উপস্থিত। তাঁহার নিকট অতীত-বর্তমান হিসাবে কিছুই নাই, কিন্তু ঐ একই মুহূর্তে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং বাস্তব জগতে বিভিন্ন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই ঐ সম্পর্কের কারণে, ঐ মুহূর্তটি অসংখ্য মুহূর্তে এবং বিভিন্ন কালের আকৃতিতে প্রতিভাত হয়।

একইভাবে, হক সুবহানুহ তায়ালার অস্তিত্ব, যাহা তাঁহার যাতের অনুরূপ বাসিতে হাকীকী (প্রকৃত অবিমিশ্র) এবং বিন্দুর মত; তন্মধ্যে কোনরূপ ভাগ বণ্টন হয় না। কিন্তু অসংখ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখার কারণে উহা বিস্তৃত এবং প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়।

এইস্থানে এইরূপ প্রশ্ন করা অবান্তর, যখন এই জ্ঞানগত অবস্থা এ কারণে যে, উহার সহিত যাতের সম্পর্ক স্থায়ী হইয়া যায়, তখন এইরূপ মনে হয়, যেন উহা যাতের আয়নায় বিদ্যমান। একইরূপে এই জ্ঞানগত অবস্থা আসমা ও সিফাতের (নাম ও গুণাবলীর) আয়নায়ও বিদ্যমান। আর এই আসমা ও সিফাত, যাহা

উহাদের প্রত্যেকের আয়নায় প্রকাশ পায়, উহা ঐ বিষয়ের একটি বিশেষ রূপ। কাজেই, ইহার দ্বারা অবশ্যম্ভাবী যে, যাতের মধ্যে বস্তুকে, অবস্তু হিসাবে ধরিতে হইবে এবং ভাগ বণ্টনের অর্থও এইরূপ। এমতাবস্থায়, আমাদের বক্তব্য এই যে, এই প্রশ্নের জবাব কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম ব্যাপার হইলঃ বিন্দু মওজুদ থাকে এবং উহা কোনভাবেই ভাগ বণ্টনযোগ্য নয়। যেমন ইহা জ্ঞানী ও অন্যান্যদের অভিমত।

দ্বিতীয় ব্যাপার হইলঃ গণিত শাস্ত্রের নিয়মে ইহা নির্ধারিত সত্য যে, বৃত্তের কেন্দ্র সব সময়ই বিন্দুই হইয়া থাকে। যাহা কখনই ভাগ বণ্টনকে স্বীকার করে না।

তৃতীয় ব্যাপার হইলঃ গণিত শাস্ত্রের নিয়মে এই কথাও প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বৃত্তের কেন্দ্র হইতে এমন রেখা নির্গত হওয়া সম্ভব, যাহা বৃত্তের শেষ প্রান্তে যাইয়া শেষ হয়। বরং কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, উহা বৃত্তের বিন্দুসমূহের উপরে গিয়া শেষ হয়। কেননা রেখার শুরু যেমন বিন্দুতে হয়, তদ্রূপ উহার সমাপ্তিও ঘটে বিন্দুতে।

কাজেই, উপরোক্ত ব্যাপার তিনটির আলোকে বলা যায় যে, যখন বিন্দু হইতে অসংখ্য রেখার উৎপত্তিতে এবং প্রকৃত-অধিক বিষয় সৃষ্টির উৎস হওয়া সত্ত্বেও বিন্দুর একক এবং মিশ্রিত হওয়ার কোন অসুবিধ হয় না এবং উহা একইরূপে অবিভক্তরূপে বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় যদি হক-সুবহানুহুর ওজুদ (অস্তিত্ব), কাছরাতে আহমী (ধারণায় অনুমিত) এর উৎস হয় এবং উহার অবিমিশ্র হওয়াতে কোনরূপ ক্ষতির কারণ হয় না। বরং ইহার দ্বারা তিনি আরো উত্তমভাবে স্বীয় এককত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ঐ যাত অতি পবিত্র, যিনি স্বীয় যাত, সিফাত এবং আসমার দ্বারা সৃষ্টিজগতের নশ্বরতা সত্ত্বেও কোনরূপ পরিবর্তনকে কবুল করেন না।

শায়েখ আকরব স্বীয় গ্রন্থ ফতুহাতে মক্কীয়ায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ প্রত্যেক রেখা, যাহা বিন্দু হইতে বৃত্তের শেষের দিকে সম্প্রসারিত হয়, উহা এক সময় বৃত্তের শেষ বিন্দুতে গিয়া মিলিত হয়। আর ঐ কেন্দ্রবিন্দু, যাহা হইতে সমস্ত রেখার উৎপত্তি ঘটে এবং বৃত্তের শেষ প্রান্তের দিকে সম্প্রসারিত হয়; উহা স্বীয় যাতের মধ্যে আধিক্যতাকে কবুল করে না। কাজেই, ইহার দ্বারা জানা গেল যে, এমন একটি জিনিস যাহা নির্ধারিত একক সদৃশ্য, উহা হইতে আধিক্যতা প্রকাশ পাইতে পারে। এতদসত্ত্বেও ঐ একক নির্ধারিত বস্তুটি স্বীয় যাতের মধ্যে আধিক্যতাকে কবুল করে না। কাজেই যিনি এইরূপ উক্তি করেন, একটি বস্তু হইতে একটি বস্তুই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা সঠিক নয়।



<u>মাওহুবে-হাক্কানী এর অস্তিত্বঃ</u> মাওহুবে-হাক্কানী এর অস্তিত্বের অর্থ এই যে, উহার আয়নে-ছাবিতার প্রকাশ হওয়া; অর্থাৎ কেবলমাত্র হক সুবহানুহুর ফযল ও মেহেরবানিতে কাওনী-তাআয়্যুনাত (সৃষ্টিগত মূলসমূহ) ফানা হওয়ার পর, তাহার উপর ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহার তাআয়্যুন (মূল) ঐ অবিমিশ্র-মূল, যাহার সম্পর্ক মরতবায়ে-জমাআর (সম্মিলিত রূপের) সহিত।



<u>হাকীকাতে মুহাম্মদীর অর্থঃ</u> যাতের তাজাল্লীর অর্থ– যাতের প্রকাশ। আর কোন জিনিসের প্রকাশ, নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হওয়া ব্যতিরেকে অসম্ভব। কাজেই যাতের-তাজাল্লী এবং প্রকাশ তা'আয়্যুনের সহিত-ই হওয়া সম্ভব। আর তা'আয়্যুন হইল সর্বপ্রথম, যাহা সমস্ত তা'আয়্যুনাতের মধ্যে সব চাইতে প্রশস্ত এবং সম্মানিত। আর ইহাকে বলা হয় অহ্দাত্ (এককত্ব)। আর ঐ ইসম যাহা সারোয়ারে কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাবদায়ে তা'আয়্যুন (নির্ধারিত মূল উৎস) যাঁহার মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের পূর্ণতা লাভ হইয়াছে; উহা হইল অহ্দাত।

বস্তুতঃ সালিকের সায়েরের শেষ প্রান্ত, এ কথার অর্থ হইলঃ তাঁহার ঐ ইসম পর্যন্ত উন্নতি লাভ হওয়া, যাহা তাঁহার মাবদায়ে-তা'আয়্যুন। কাজেই তাজাল্লীয়ে-

যাত, হজরত মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষ মর্যাদার কারণ। আর ঐ তা'আয়্যুন, যাহা সমস্ত সিফাত, আসমা, নিসবত (সম্বন্ধ) ও ইতিবারের (ধারণা) উপর কোন পার্থক্য ব্যতিরেকে সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য, উহা অহেদীয়াতের (এককত্বের) পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং তন্মধ্যে ঐ সমস্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা সমস্ত মাখলুকাতের জন্য মাব্দায়ে-তা'আয়্যুন। আর ঐ সমস্ত ইস্ম, যাহা সমস্ত মাখলুকাতের জন্য মাব্দায়ে তা'আয়্যুন, উহার অর্থ ঐ সমস্ত সিফাত এবং আস্মা, যাহা ঐ তা'আয়্যুনের মধ্যে বিদ্যমান এবং এককত্বের পর্যায়ে বিস্তৃতি হাসিল করিয়াছে। কাজেই, প্রত্যেক সালিকের ভ্রমণের শেষসীমা ঐ ইস্ম ও সিফাত পর্যন্ত হইয়া থাকে, যাহা তাঁহার জন্য নির্ধারিত আছে। আর এক কথা এই যে, তাজাল্লীয়ে যাতী ঐ ইস্মের পর্দার মধ্যে নিহিত, যা ঐ তাজাল্লীধারী ব্যক্তির নির্ধারিত মূল উৎসে বিদ্যমান।

বস্তুতঃ হাকীকতে-মুহাম্মদী-ই সবকিছু এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টজীবের হাকীকত উহার অংশ বিশেষ মাত্র। আর যে জামাত মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণে ধন্য হয় এবং উহার উচ্চমর্যাদায় সমাসীন হইতে সক্ষম হয়, তাহারাও স্ব-স্ব সম্পর্কে ও অনুসরণের মর্তবা অনুযায়ী, তাজাল্লীয়ে যাতী হইতে অংশ প্রাপ্ত হয়। কেননা, তিনি স. অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহার হাকীকত (তত্ত্ব) সমস্ত সৃষ্টজীবের হাকীকতের মূল। কাজেই, তাঁহারা পরস্পর শ্রেণীগত পার্থক্য ও ব্যাখ্যার অপ্রশস্ততা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। যেন তাহাদের দর্শনীয় বস্তু ও বিভক্তির পর্দা ব্যতীতই বণ্টনের স্থান এবং উহার নির্ধারিত মূল উৎসও উহাই, বিভক্তি নয়।

উদাহরণ স্বরূপ "ইস্ম" কে গ্রহণ করণ, যাহা এই কথার অন্তরালে যে, উহা নিজেই কোন একটি অর্থ প্রকাশ করে এবং কোন কালের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা একটি বিশেষ ধরনের কলেমা (বাক্য)। আর এই পর্দাটি, কলেমার বাকী সমস্ত অংশ হইতে উহাকে পার্থক্য নির্ণয়কারী। কিন্তু যখন ইস্ম (বিশেষ্য) নিজেকে ফে'ল (ক্রিয়া) ও হরফের (অব্যয়) অনুরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন উহা বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা এবং পরস্পর পার্থক্যের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হয়। এ সময় উহা স্বীয় মাবদায়ে-তা'আয়্যুন হিসাবে ঐ কালেমাকে প্রাপ্ত হয়, উহার কোন অংশকে নয়।



বাহ্যিক সিরাত-সুরতের সহিত, জ্ঞানগত সুরতের সম্পর্কঃ বস্তুর জ্ঞানগত সুরতের অর্থ হইল জ্ঞানের পরিধির মধ্যে উহার একটি হইতে অপরটির পার্থক্য প্রমাণিত হওয়া। আর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী সূফীদের বক্তব্য, (আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের সংখ্যাকে বৃদ্ধি করুন) বস্তুর সুরত কেবলমাত্র জ্ঞানের মধ্যেই পরিসীমিত এবং উহার আহকাম ও আছার (নিদর্শন) বাহিরে পরিদৃষ্ট হয়। এই কথার অর্থ হইল— বস্তুর পাস্পরিক পার্থক্য জ্ঞানের মধ্যে সীমিত। আর বাহ্যতঃ হক সুবহানুহু তায়ালা স্বীয় অহ্‌দাতে যাতীয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত, যাহার প্রকাশ উহার নিদর্শনাবলীতে বিদ্যমান। এই অর্থ নয় যে, জ্ঞানগত সূরতের অর্থ ঐ সূরতসমূহ, যাহা বাহিরে বিদ্যমান। কেননা, এই সূরতগুলিও ঐ সমস্ত জ্ঞানগত সূরতের পরিপূরক, উহার আয়েন (মূল) নয়।

উদাহরণতঃ বলা যায়, প্রত্যেক জ্ঞানগত পার্থক্য একটি বিশেষ সূরতের দাবী রাখে। যেমন, ঐ বস্তুগুলি সোজা বা বাঁকা, সোজা অবস্থায় দণ্ডায়মান বা বাঁকা অবস্থায় দণ্ডায়মান। আর এই বস্তুগুলি ঐ জ্ঞানগত সুরতের নিদর্শন মাত্র। যেমন, গরম হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া, শুষ্ক হওয়া, ভিজা হওয়া, হাল্‌কা হওয়া, ভারী হওয়া, সূক্ষ্ম হওয়া এবং স্থুল হওয়া— এ সমস্তই উহার আহ্‌কাম এবং নিদর্শন মাত্র। আর প্রত্যেক অবস্থা, যাহা জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লাভ করে, উহা অসংখ্য অবস্থার সমন্বয় মাত্র। এই জন্য অবশ্যই জ্ঞানগত সূরতের মধ্যে, প্রত্যেক অবস্থার অনুরূপ, অসংখ্য পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটি আলাদা হুকুম ও আলাদা নিদর্শনের দাবী রাখে। আর বাহিরে এমন একটি অজ্ঞাত অবস্থার সম্পর্কের কারণে, যাহা ঐ সমস্ত বস্তুর সত্ত্বার সহিত লাভ হয়- এমন মনে হয় যে, উহাদের এই পারস্পরিক পার্থক্য বাহিরেও বিদ্যমান। বস্তুতঃ দর্শন শক্তি ও শ্রবণ শক্তি পৃথক হওয়ায় বাহিরেও উহারা আলাদা ভাবে বিদ্যমান। একই ভাবে, স্বাদ গ্রহণের শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি হইতে পৃথক। আর এ ভাবেই অন্যান্য শক্তিগুলিও একটি অপরটি হইতে পৃথক।

কাজেই, এই নির্ধারণ ও পার্থক্য, যাহা জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়, উহাকে সম্ভাব্যের বাস্তবরূপ হিসাবে আখ্যায়িত করে। আর উহার সম্পর্ক হইল মরতবায়ে জমাআর (মিলিত অবস্থার) সহিত। আর উহার এই সমস্ত আহকাম ও নিদর্শন, যাহা সূরতাকারে বাহিরে পাওয়া যায়, উহার সম্পর্ক হইল মরতবায়ে ফরকের (বিচ্ছিন্ন অবস্থার) সহিত। কেননা, উহা এই পার্থক্যের দ্বারাসৃষ্টি হইয়াছে এবং উহার প্রকাশের অর্থ-ই হইল এই পার্থক্য। যাহা কিছু সম্মিলিত অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখে, উহা হাকায়েকে ইলাহীর (আল্লাহর হাকিকত) সহিত সম্পৃক্ত। আর যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন অবস্থার সহিত সম্পর্কিত, উহা হাকায়েকে কাওনীর (সৃষ্ট বস্তুর হাকিকত) সহিত সম্পৃক্ত। যদিও ইহার উভয় অবস্থা প্রকৃতপক্ষে যাতের মধ্যে নিহিত, তবুও উহাতে দ্বিতীয় অবস্থার অনুপ্রবেশ, প্রথমাবস্থার কারণে হইয়া থাকে, যাতের কারণে হয় না। কাজেই প্রথমাবস্থা হইল বস্তুর শ্রেণী হিসাবে এবং দ্বিতীয় অবস্থা হইল উহার অংশের অংশ হিসাবে। বস্তুতঃ যখন সালিক বিচ্ছিন্নরূপের সমস্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া, স্বীয় সম্মিলিত এককরূপে পৌঁছায়, তখন যাতী তাজাল্লী তাহার মূল সত্ত্বায় প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহতায়ালাই এ ব্যপারে সমধিক অবগত।



<u>হক তায়ালার যাতের মধ্যে ইয়াকীনের তিনটি স্তর ঃ</u>

১। হক সুব্‌হানুহু তায়ালার যাতের ব্যাপারে ইল্‌মুল ইয়াকীন (জ্ঞানগত প্রত্যয়) হাসিল হওয়ার অর্থ হইল- ঐ সমস্ত নিদর্শনাবলীর দর্শন, যদ্‌দ্বারা হক জাল্লাশানুহুর যাতকে বোঝা যায়। কেননা, যাতের দর্শন তো কেবলমাত্র সেই নফসের মধ্যেই সম্ভব, যাহার জন্য তাজাল্লী লাভ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোথাও সম্ভব নয়। সালিক যাহা কিছু বাহিরে দর্শন করে, উহার সবই নিদর্শন মাত্র। কেননা নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ্‌র যাতকে বোঝা যায় না। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত তাজাল্লি, যাহা আকৃতি ও নূরের আকারে প্রকাশিত হয় এবং তাজাল্লি লাভকারীর

সূরত ব্যতীতও প্রকাশিত হয়, উহা ইল্‌মুল-ইয়াকীনের অন্তর্ভুক্ত। যে সূরত বা নূর প্রকাশ পায়, চাই ঐ নূর রংগীন হউক বা বেরংগী, এমতাবস্থায় উহার অবস্থা একই। আমার শ্রদ্ধেয় হজরত মৌলভী আব্দুর রহমান জামী র.[১] 'শরহে লুমআত' গ্রন্থে নিম্নোক্ত কবিতাটি বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ

আয়ে দোস্ত, তুরা বিহ্ হার-মাকা মী-মুসতাম্
হারদম থাব্‌রাত্ আয্-ই ও আঁ মী জুস্‌তাম।

যাকে দেখি, প্রশ্ন করি জানে কে খবর?
তুমি কোথা খুঁজে মরি, ওহে দোস্ত মোর।

এই কবিতায় মুশাহেদাহে আফাকীর (বাহ্যিক দর্শনের) প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে, যাহা ইল্‌মুল ইয়াকীনের অবস্থার অনুকূল।

বস্তুতঃ এই শুহুদে আফাকী আসল মাকসুদ সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করে না। বরং কেবলমাত্র আলামত ও নিদর্শনাবলীর সাহায্যে উহার ধারণা প্রদান করে। যেমন ধোঁয়া এবং উষ্ণতা, দলিল এবং নিদর্শন হওয়া ব্যতিরেকে, আগুন মওজুদ হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। অবশ্য, এই ধরনের দর্শন জ্ঞান-বৃত্তের বাহিরে নয় এবং ইহা আয়নুল-ইয়াকীনের আওতায় পড়ে না।

হজরত কুতুবুল আকতাব নাসিরুদ্দীন খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র.[২] বলিতেন, সায়ের দুই ধরনের হয়। একটি সায়েরে মুসতাতীল এবং দ্বিতীয়টি সায়েরে মুসতাদীর। সায়েরে মুসতাতীল হইল দূর হইতে আরো দূরের সায়ের। আর সায়েরে মুসতাদীর হইল নিকট হইতে নিকটতর সায়ের। সায়েরে মুসতাতীলের উদ্দেশ্য হইল মাকসুদকে স্বীয় বৃত্তের বাহিরে অন্বেষণ করা। আর সায়েরে মুসতাদীরের উদ্দেশ্য হইল স্বীয় দিলের চারিদিকে ঘূর্ণন এবং নিজের মধ্যেই অভীষ্ট মাকসুদের অনুসন্ধান করা।

---

১. হজরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী র. ফার্সী ভাষার একজন মশহুর কবি, দ্বীনের আলেম এবং শরীয়ত ও তরীকতের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি ২৬শে শাবান ৮১৭ হিজরীতে হারীর বা জাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮ই মহররম ৮৯৮ হিজরীতে ৮১ বৎসর বয়সে ইনতেকাল করেন। তাঁহার মাযার হিরাতে অবস্থিত। তিনি হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। তিনি প্রায় ৪৪ খানা গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে 'নফ্‌হাতুল উনস্' খুবই প্রসিদ্ধ।

২. হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. ৮০৬ হিজরীতে, রমজান মাসে তাসখন্দের অন্তর্গত বাগিস্তান নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. এর নিকট মুরীদ হন এবং পরবর্তীকালে খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন। তৎকালীন বাদশাহ্ তাঁহার মুরিদ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজে সব সময় চাষাবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি অত্যন্ত বড় বুজর্গ এবং উচ্চ স্তরের কামালাত ও কারামত সম্পন্ন অলী ছিলেন। তিনি ২৯শে রবিউল আওয়াল ৮৯৫ হিজরীতে ৯০ বৎসর বয়সে ইনতেকাল করেন।

২. আয়নুল ইয়াকীনের অর্থ হইলঃ বান্দার স্বীয় তা'আয়্যুনের পর্দা উন্মোচিত হওয়ার পর, হক সুবহানুহু তায়ালার দর্শন হাসিল হওয়া। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী সূফীগণ এই ধরনের দর্শনকে "অবিমিশ্র অনুভূতি" হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এইরূপ অনুভূতি সাধারণ লোকদেরও লাভ হইতে পারে। কিন্তু পার্থক্যঃ বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য হক সুবহানুহু ব্যতীত অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিতে তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হন না, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনের দৃষ্টিতে, হক সুবহানুহ ব্যতীত আর কিছুই অবলোকন করেন না। সাধারণ ব্যক্তিদের অবস্থা হইল ইহার বিপরীত। আর এই ধরনের অনুভূতি জ্ঞানের বিপরীত। বরং সেখানে বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নাই। যেমন, ইলম বা জ্ঞান, আয়নুল ইয়াকিনরূপ দর্শনের বিপরীত। একইভাবে আয়নুল ইয়াকিন ইলমুল ইয়াকীনের পর্দাস্বরূপ। যেমন, শায়েখ আকবর[১] র. স্বীয় গ্রন্থ "কিতাবুল হাজাবে" বর্ণনা করিয়াছেন, ইলমুল ইয়াকীন আয়নুল ইয়াকীনের জন্য পর্দাস্বরূপ এবং আয়নুল ইয়াকীনও ইলমুল ইয়াকীনের জন্য তদ্রূপ। তিনি অন্যত্র বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ মারেফাত হাসিল করিয়াছে, তাহার নিদর্শন এই যে, সে ব্যক্তি যখন স্বীয় গোপন অবস্থার দিকে দৃকপাত করে, তখন সে উহা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারে না। এই ধরনের ব্যক্তিই মারেফাতে পূর্ণতার অধিকারী, যাহার উপরে মারেফাতের কোন স্তর নাই।

৩। হাককুল ইয়াকীনের অর্থ হইলঃ হক তায়ালা জাল্লা শানুহুর, তাঁহার যাতের সহিত দর্শন এবং হক সুবহানুহুকে নিজে, নিজের অনুরূপ ধারণা করা। আর এই হাককুল ইয়াকীন, বাকা বিল্লাহের অবস্থায় হাসিল হয়। অর্থাৎ প্রকৃত ফানা লাভের পর, হক সুবহানুহু তায়ালা তাঁহাকে, স্বীয় ক্ষমতায় মাওহুবে হাককানী (প্রকৃত সত্য) এর অস্তিত্বে গৌরবান্বিত করেন এবং তাহাকে বেহুঁশী ও বেখুদী হইতে হুঁশ এবং বোধ দান করেন। এইস্থানে উপনীত হওয়ার পর, এলমুল ইয়াকীন এবং আয়নুল ইয়াকীন, একটি অন্যের পর্দাস্বরূপ বিরাজ করে না। বরং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনে জ্ঞানী হয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দর্শনকারী হয়। আর এই তা'আয়্যুন, যাহাকে সুফীগণ হকের অনুরূপ মনে করেন, তাহা সৃষ্টিগত তা'আয়্যুন নয়। কেননা, উহার

১. হজরত শায়েখ মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী র. শায়েখে আকবর উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি ১৭ই রমজান, ৫৬০ হিজরীতে স্পেনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শহর মরিসায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাহিরি ও বাতিনী পূর্ণতা লাভ করেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা, উহাদের মধ্যে ফুসূসূল হিকাম এবং ফতুহাতে মককীয়া খুবই প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ২২শে রবিউস-সানি, ৬৩৮ হিজরীতে ইনতেকাল করেন।

তো কোন নিশানাই অবশিষ্ট নাই। বরং এই তা'আয়্যুন হাককানী হয়, যাহাকে সম্মানিত বুজর্গগণ অজুদে মাওহুবে হাককানী (নিছক হকের অস্তিত্বে অস্তিত্ববান) নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন, এ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। আর ঐ সমস্ত আকৃতিগত তাজাল্লীর অধিকারী ব্যক্তিগণ, যাহারা স্বীয় সুরতসমূহ এবং তা'আয়্যুনাতকে হক মনে করেন, উহা হইল তা'আয়্যুনাতে কাওনী (সৃষ্টিগত নির্ধারণ) কেননা, তাঁহাদের উপর কোন ফানার অবস্থা সৃষ্টি হয় না। আর এই পার্থক্যটি কোন কোন মধ্যস্তরের সুফীদের নিকট পরিষ্কার না হওয়ায় তাঁহারা এইরূপ খেয়াল করেন যে, বড় বড় সূফীগণ হাককুল ইয়াকীনের পর্যায়ে এই তা'আয়্যুনাতে কাওনীকে হক মনে করিতেন। আর তাঁহাদের এই অজ্ঞতা, বড় বড় সুফীদের সমালোচনার কারণ হইয়াছে। আর তাঁহারা এইরূপও ধারণা করেন, তাঁহাদের প্রথম পদক্ষেপে, যাহা হইল তাজাল্লীয়ে সুরীর মাকাম এবং যাহাকে তাঁহারা কাশফে মালাকুত (সৃষ্টি জগতের দর্শন) হিসাবে মনে করেন, সেখানেই ইয়াকীন হাসিল হয়।



মারেফত তেরো

সুফী এবং দার্শনিকদের মধ্যে মারেফাত সম্পর্কে মতানৈক্যঃ আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফাত অর্জন, সুফীয়ায়ে কিরাম ও অধিকাংশ দার্শনিকদের নিকট সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের প্রচেষ্টার সঠিক বিনিময় প্রদান করুন। কিন্তু সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে যে, কীভাবে এই মারেফাত লাভ করা যাইতে পারে। সুফীয়ায়ে কিরাম বলেন, মারেফাত অর্জনের তরীকা হইল– রিয়াযাত (কঠোর সাধনা) এবং তাযকীয়ায়ে বাতিন (অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি)। অপরপক্ষে, আশায়েরা ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের অভিমত হইল- মারেফাত অর্জনের তরীকা হইল- বিশেষ ভাবে চিন্তা ভাবনা এবং দলীল প্রমাণ অনুসন্ধান করা।

আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে, এই উভয় দলের মধ্যে যে ঝগড়া, ইহা কেবল মাত্র 'মারেফাত' শব্দটির ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমিত। সূফীয়ায়ে কিরাম মারেফাত শব্দের দ্বারা অবিমিশ্রি যাতের জ্ঞানলাভ করা মনে করেন, যাহার সম্পর্ক হইল উন্মত্ততার সহিত। আর ইহা স্পষ্ট যে, ইহা তাসদীকে ইমানীর (ইমানের সত্যতা স্বীকার) প্রক্রিয়ার বিপরীত বস্তু। আর দার্শনিকগণ মারেফাত দ্বারা তাসদীকে ইমানীর প্রক্রিয়াই মনে করেন। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, মারেফাত শব্দের প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে, উহা লাভের তরিকা হইল- কঠোর সাধনা এবং অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি। আর তাসদীকে ইমানীর প্রক্রিয়া লাভের তরীকা হইল- চিন্তা ভাবনা এবং দলীল প্রমাণ। আর যে সমস্ত আলেমগণ বলেন, সর্বপ্রথম বস্তু, যাহা একজন নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব, উহা হইল আল্লাহতায়ালার মারেফাত লাভ। এই স্থানে মারেফাতের অর্থ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি, প্রথমটি নয়। কেননা, প্রথম ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে মারেফাত লাভ হাককুল ইয়াকীনের মধ্যে হইয়া থাকে, যাহা আহালুল্লাহদের পূর্ণতার শেষ বিন্দু।

বস্তুতঃ আমি মারেফাত শব্দটির ব্যাখ্যার পার্থক্য অন্যভাবে বর্ণনা করিতেছি। সূফীয়ায়ে কিরামদের মারেফাতকে হক তায়ালা সুবহানুহুর সহিত ইলমে হুজুরীর দ্বারা তাবির করা যায়, যাহা ফানা ও বাকা লাভের পর হাসিল হয়। এই মারেফাতকে জানা এবং পাওয়ার সহিত ব্যাখ্যা করা যায়। আর দার্শনিকদের মারেফাতের অর্থ হক তায়ালা সুবহানুহুর সহিত সম্পর্ক, ইলমে হুসুলীর সহিত সম্পৃক্ত, যাহা চিন্তা ভাবনা ও দলিল প্রমাণের দ্বারা হাসিল হয়। ইহার বিশ্লেষণ এই যে, প্রত্যেক ঐ জ্ঞান, যাহা বাহ্যিকভাবে লাভ হয়, উহার অর্থ হইল- নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সুরত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। অথবা ইহা এইভাবেও বলা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির চিন্তাশক্তির আওতায় যে সুরত আসে, ঐ জ্ঞানকে ইলমে হুসুলী বলে। আর যে জ্ঞানের অবস্থা এইরূপ নয়, অর্থাৎ যাহা বাহ্যিকভাবে লাভ করা যায় না, বরং উহা জ্ঞানী ব্যক্তির যাতের সত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট, ঐ ইলমকে ইলমে হুজুরী বলে। আর যখন কোন আরিফ ব্যক্তি স্বীয় যাত ও সিফাতের বিলীনত্বের পর, বাকাবিল্লাহের দ্বারা সম্মানিত হন এবং তাঁহার অস্তিত্ব সৃষ্টিগত আকৃতি হইতে একেবারেই সম্পর্কহীন হয় এবং হাকীকাত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে, তখন ইহা অবশ্যই ইলমে হুসুলী হইতে ইলমে হুজুরীতে রূপান্তরিত হয় এবং জানা ও পাওয়ার মর্তবা হাসিল করে। কেননা প্রাপ্তি, প্রাপকের যাতের বাহিরে হওয়া সম্ভব নয়।

সন্দেহের অপনোদনঃ মাআযাল্লাহ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)। এখানে যেন কোন সাদাসিধা ব্যক্তি হুলুল (প্রবিষ্ট হওয়া) ও ইত্তিহাদের (এক হইয়া যাওয়া) অর্থ না বোঝে এবং পূর্ববর্তী দ্বীনের নিশান বরদারদের প্রতি এতটুকু খারাপ ধারণা না করে। অথবা নিজে যেন ভ্রষ্ট আকীদার অনুসরণ করিয়া ধ্বংস না হইয়া যায়। জানা

উচিৎ যে, বেলায়েতের শান চিন্তা-ভাবনালব্ধ জ্ঞান হইতে অনেক উন্নত এবং ইহাদের কাশফের তরীকাও বিশুদ্ধ। এই স্থানে চিন্তা-ভাবনা ও দলিল প্রমাণের কোন অবকাশই নাই।

বিদ্বানগণ এবং ইমাম গাযযালী র. হক-সুবহানুহু তায়ালার যাতের মারেফাত সম্পর্কে অস্বীকার করা প্রসংগে যাহা বলিয়াছেন উহা হইলঃ ঐ মারেফাত তাসদীকে ইমানীর ন্যায়। বস্তুতঃ তাঁহাদের অস্বীকারের দলিল দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যেমন তাঁহাদের ভাষায় হক-তায়ালার যাতের মারেফাত, চাই উহা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই হউক অথবা চিন্তা ভাবনার দ্বারা– উভয়ই বাতিল।

দর্শন শাস্ত্রে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা লিখিত আছে। বস্তুতঃ তাঁহারা যাতের মারেফাতকে অস্বীকারের দ্বারা, যাতের হাকীকাত সম্পর্কে জ্ঞানলাভের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, মারিফাত বিঅজহিন্ (কোন এক ধরনের মারেফাত বা পরিচয় লাভ) কে অস্বীকার করেন নাই। কেননা, মারেফাতে যাত বিঅজহিন তো সকলেরই হাসিল আছে। যেমন, তাহারা যাতের মারেফাত, তাঁহার সৃষ্টিগুণ অথবা রিয্‌কদাতাগুণ হিসাবে জানে।

প্রকাশ থাকে যে, কোন বস্তুর বিশেষ এক কারণের পরিচয় এবং উহার আসল পরিচয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আর এখানে যে সম্পর্কের আলোচনা করিতেছি, উহা হইল যাতের আসল পরিচয় সম্পর্কে, বিশেষ এক ধরনের পরিচয় সম্পর্কে নয়। যদি কেহ বলেন, এই ব্যাখ্যা ফেলে খালিক (সৃষ্টিকরণ কাজ) এবং ফেলে রিযকের (রিজিক দেওয়ার কাজ) মধ্যে তো স্বীকৃত। কেননা, এখানে বলা যায়, ইহাতে তো ফেলে খালককে শুধু জানা যায়, যাতকে, ফেলে খালকের সহিত নয়। কিন্তু এ ধরনের উক্তি খালেকিয়াতের মধ্যে সঠিক নয়। কেননা খালেকিয়াতের অর্থ তো ঐ যাত, যাহার জন্য ফেলে খালক নির্ধারিত। কাজেই, যাতের পরিচয় লাভ, এর সিফাতের (গুণের) দ্বারাই সম্ভব।

এই ধরনের উক্তির জবাবে আমার বক্তব্য হইলঃ যাতের দ্বারা অর্থ হইল হয়তো, যাতের মাফহুম (বোধ) অথবা যাতের মিসদাক (অবিকল যাত)। যদি মাফহুম হয়, তবে উহাতো নিতান্ত সাধারণ বিষয় মাত্র। কাজেই জ্ঞাতব্য বিষয় হইল উহা। যাত নয়। আর যদি উহার অর্থ মিসদাক হয় তবে উহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ, যাতের পরিচয় লাভের জন্য আবশ্যকীয়। কেননা, কোন বস্তুর হাকীকতের অর্থ হইল, সেই আসল বস্তু। কাজেই, যদি সেই ইলমের সম্পর্ক হক-তায়ালার যাতের সহিত হয়, তবে অবশ্যই উহা হক-তায়ালার যাতের ইলম হইবে। কেননা, যাতের মধ্যে কোনরূপ ভগ্নাংশ নাই, যে উহার কিছু অংশ জানা যাইবে এবং কিছু অংশ অজানা থাকিবে। বরং উহাতো বাসীতে হাকিকী (প্রকৃতই অবিভাজ্য)। কাজেই যখন মনে করা হয় যে, ইলম তাঁহার যাতের সহিত

সম্পর্কিত, তখন ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত যাতের জ্ঞানলাভও আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহা মাখলুকাতের বরখেলাফ। কেননা, উহাদের কোন এক কারণের জ্ঞানলাভ, উহাদের হাকীকতের জ্ঞানলাভের জন্য আবশ্যকীয় নয় বরং উহাদের হাকীকতের কিছু অংশ, উক্ত কারণের দ্বারা জানা যায়। আর হাকীকতের অর্থ হইল সমস্ত হাকীকতই। যেমন মানুষকে এমন কোন বস্তুর সাহায্যে জানা, যদ্‌দ্বারা তাহার হরকতে ইরাদীকে বোঝা যায়। ইহার দ্বারা ইনসানের হাকীকতের কিছু অংশ জানা যায়, তাহার হাকীকতের পুরা অংশ নয়। অনুরূপভাবে আশ্চর্যজনক কাজের বিষয়টি জানার উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা ইনসানের হাকীকতের একটি অংশই জানা যায় মাত্র।

ফলকথা, যেখানেই হাকীকত ভগ্নাংশ হইতে পারে, সেখানে কোন বস্তুর সম্পর্কে একটি জ্ঞান, উহার প্রকৃত ইলমের জন্য আবশ্যকীয় নয়। আর যেখানে সে বস্তুটি প্রকৃত অবিমিশ্র হইবে, যাহা কোনভাবেই বিভাজ্যকে গ্রহণ করে না, যদি ইলম ইহার সহিত সম্পর্কিত হয়, আর উহা যে ধরনেরই ইলম হউক না কেন, উহার হাকীকত অবশ্যই জানা যাইবে। যেমন, আল্লাহতায়ালার যাতের ইলম। অবশ্য যাতে হকের হাকীকতের পরিচয় লাভ করা অসম্ভব। এ কারণে, হক জাল্লা শানুহুর যাতের মারেফাত, উপরোক্ত অর্থে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চাই সে মারেফাত হাকীকতের হউক, অথবা উহার কোন এক কারণের। কেননা, এলেমের হাকীকতের দাবী এই যে, উহা জ্ঞাত বস্তুকে পরিবেষ্টন করিবে এবং মা সেওয়া হইতে উহাকে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবে। কিন্তু হক তায়ালা আযযা শানুহুর যাত তো কোন ব্যক্তির জ্ঞানের আয়ত্বে আসা সম্ভব নয়। যেমন, আল কোরআনের বাণী- ‘ওয়ালা ইউহীতুনা বিহি ইলমান’।

অর্থাৎ ইলমের দ্বারা তাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিতে পারে না। কেননা, ইহাতা (বেষ্টন করা) এবং তমীযের (পৃথক করা) দাবী এই যে, বস্তুটি সীমিত হইবে, যাহার ইহাতা এবং তমীয হাসিল হইতেছে। আর বারী তায়ালার শানের মধ্যে ইহা সম্ভব নয়। কাজেই, উহার সহিত জ্ঞানের কোন সম্পর্কই হইতে পারে না এবং হক তায়ালার জ্ঞান কাহারো লাভ হইতে পারে না। বস্তুতঃ যখন তাঁহার কারণ সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ হয়, তখন লোকেরা এইরূপ মনে করে যে, এ কারণ সম্পর্কীয় জ্ঞানের দ্বারাই তাহাদের হক-তায়ালার যাতের ইলম হাসিল হইয়াছে। কিন্তু এ ধরনের সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুধাবন করা, তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বরং আমি বলিতে চাই যে, হক-তায়ালা জাল্লা শানুহুর সিফাতও তাঁহার যাতের মতই অজ্ঞাত। কোনভাবেই উহা জ্ঞানের আওতায় আসে না এবং কোন মাখলুকের পক্ষে উহা জানাও সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হক-তায়ালার সিফাতে ইলমের কোন পরিসীমা নাই এবং মাখলুকাতের জন্য উহা পরিসীমিত। কেননা,

সিফাতে ইলমের যাহা কিছু মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, তদ্‌দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার তাহার নাই। অবশ্য সে এতটুকু বলার ক্ষমতা রাখে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন, সেই কানুন মাফিক কাজের ফলশ্রুতি কী হইতে পারে। এমতাবস্থায় যদি আমরা বলি, ইহা মানুষের সিফাতে ইলমের ফলশ্রুতি– যদিও ইহা কেবল মুখেই বলি, যেমন কোন কোন দার্শনিকের অভিমত– তবুও এ কথা সত্য যে, মানুষের পক্ষে কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলাই সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতে ইলমের অবস্থা এইরূপ নয়। বরং তাঁহার ইলমের সহিত মাখলুকের সিফাতে ইলমের নামমাত্র মিল বা সম্পর্ক বিদ্যমান। একইভাবে হক-তায়ালা জাল্লা শানুহুর মধ্যে কুদরত (ক্ষমতা), ইরাদা (ইচ্ছা) সিফাত, এবং মাব্‌দা (উৎসস্থল) ও মান্‌শা (লক্ষ্যস্থল) সিফাত বিদ্যমান। কিন্তু কুদরত ও ইরাদা যাহা মাখলুকাতের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, উহার অবস্থা এইরূপ নয়। বরং কোন বস্তুর সহিত যখন তাহাদের কুদরত ও ইরাদা সম্পর্কিত হয়, তখন আল্লাহ্‌তায়ালাই কুদরতের নিয়মানুসারে সেই বস্তুকে পয়দা করিয়া দেন। এমতাবস্থায়, ঐ বস্তুর সৃষ্টিতে তাহাদের কুদরতের কোন হাত নাই। সমস্ত সিফাতের অবস্থা এইরূপ-ই। আর প্রত্যেক জ্ঞাত বিষয়, যাহা জ্ঞানীর সহিত সম্পর্কিত নয়, উহা তাহার জ্ঞানের বাহিরে এবং সে ঐ জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। নির্ভরযোগ্য আলিমদের একটি স্থিরকৃত অভিমত এই যে, কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ, উহার বিপরীত বস্তু দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁহার সিফাত সম্পর্কে কোনভাবেই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহতায়ালার যাত বেচুঁ এবং বেচেগুঁ (অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়)। একইরূপে তাঁহার সিফাতও তুলনাহীন এবং অবর্ণনীয়, বেঁচুর দুনিয়ায় চুঁ কীভাবে রাস্তা পাইতে পারে?

প্রশ্নঃ এই স্থানে একটি জটিল প্রশ্নের অবকাশ আছে এবং উহা এই– যখন হক-তায়ালার যাত ও সিফাতের ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়, তখন তাঁহার মারেফাত লাভ করাও দুষ্কর। এমতাবস্থায়, তাঁহার মারিফাত হাসিল করা ওয়াজিব, এ কথার অর্থ কি?

জবাবঃ আমার বক্তব্য এই যে, যাত ও সিফাতের মারেফাত লাভের অর্থ, যাত হইতে বিপরীতধর্মী বস্তুকে দূরীভূত এবং অপসারণ করা, যাতের ইলম হাসিল করা নয়। যেমন, যাতের মারেফাতের অর্থ হইল উহা জিস্‌ম (শরীরি) নয়, উহা জওহর (স্থানের মুখাপেক্ষী) নয়, উহা আরজ (অস্থায়ী বস্তু) নয় এবং সিফাতের মধ্যে মারেফাতের অর্থ হইল- উহার মধ্যে জিহালত্‌ (অজ্ঞতা) নাই, আজিযী (অক্ষমতা) নাই, অন্ধত্ব নাই এবং বধিরতা নাই। বস্তুতঃ এই সমস্ত বৈপরীত্য দূরীভূত হওয়ার ফলেই, হক-তায়ালা জাল্লা শানুহুর যাত ও সিফাতের ওজুব (অবশ্যম্ভাবী) হওয়া

বুঝা যায়। যেমন কোন কবির ভাষায়- 'পেশ আযীপায়ে নাবারদাহ্ আন্দ কে হাস্ত' অর্থাৎ তাঁহার হাস্তীর (অস্তিত্বের) চাইতে, তাহার অধিক কোন ঠিকানা নাই।

প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, হক-তায়ালার যাতের উপর এইরূপ হুকুম লাগান হয় যে, তিনি আলিম (জ্ঞানী), তিনি কাদির (ক্ষমতাবান) ইত্যাদি। আর এই ধরনের হুকুম লাগানোতে যাত সম্পর্কে ধারণা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কেননা, হুকুম- চাই উহা ইতিবাচক হউক অথবা নেতিবাচক, মাওযূ (আলোচ্যবস্তু) ব্যতীত তাহা ধারণাতেই আসিতে পারে না।

জবাবঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য হইল- এ ব্যাপারে আলোচ্য বস্তুর ধারণা হওয়া খুবই জরুরী। কিন্তু ইহার দ্বারা যে বস্তুটির ধারণা হয়, উহা যাত নয়। হক-তায়ালা জাল্লা শানুহুর যাত উহা হইতে পবিত্র ও মুক্ত। কিন্তু এই ধারণাকৃত বস্তুটি পবিত্র, যাহা ঐ যাতেরই সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উহা অপবিত্র ধারণাকৃত বস্তুর চাইতে যাতের সহিত অধিক সম্পর্ক রাখে। কাজেই উহার ধারণা, যাতের-ই ধারণা হিসাবে বোঝা হইয়াছে। আর এই ধরনের বুঝ, জরুরতের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা, মানুষের-শক্তি হক-তায়ালা শানুহুর যাত সম্পর্কে অনুভব করিতে অপারগ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের জন্য তাঁহার আহকামের পরিচয়লাভ করা জরুরী, যদ্দ্বারা তাঁহার যাতকে, গায়ের-যাত হইতে পার্থক্য করা যাইতে পারে। কোন কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের অভিমত হইল, মারেফাতের অর্থ- হাদিছ (অস্থায়ী) ও কাদিমের (স্থায়ী) মধ্যে পার্থক্য সূচিত হওয়া। ইমামুল মুসলেমিন হজরত আবু হানিফা র.[১] এর বক্তব্য ইহার অনুরূপ। যেমনঃ 'ইয়া আল্লাহ! তোমার যাত পবিত্র। তোমার যেমন ইবাদত করিবার হক ছিল, আমি তোমার তেমন ইবাদত করিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার মারেফাতের যেরূপ হক ছিল, আমি তোমার মারেফাত হাসিল করিয়াছি।' সেই যাত পবিত্র! যিনি তাঁহার দিকে মাখলুকের জন্য কোন রাস্তা রাখেন নাই, তাঁহার মারেফাত সম্পর্কে অপারগতা ব্যতীত। কিন্তু যে মারিফাত আহলুল্লাহ্ (আল্লাহর পরিবারদের জন্য খাস, উহার প্রকাশ তালেবদের (অন্বেষণকারীদের) ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী হয়। যেমন কোন কবির ভাষায়ঃ

ব-কদরে আয়েনা হাসানে তুমি নুমায়েদ-রু,
অর্থাৎ তোমার প্রকাশ আয়নার ধারণ ক্ষমতানুযায়ী।

---

১. তাঁহার আসল নাম হইল নোমান ইবনে ছাবিত র. এবং কুনিয়াত হইল আবু হানীফা র.। তিনি ইমামে আজম উপধিতে বিশ্ব-বিখ্যাত। তিনি ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে আব্বাসীয় খলীফা মনসুরের সময় বাগদাদে ইনতিকাল করেন। সমস্ত ইসলামী দুনিয়ায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরাট দল তাঁহারই প্রবর্তিত হানাফী মযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর এই আয়নার সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা, আয়নার অধিকারী ব্যক্তির ক্ষমতানুযায়ী হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালনকারী ঐ বস্তুর একটি বিশেষ কারণ এবং ধারণকারী হয়। স্বীয় ঐ খাস বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অন্য কিছুতে মারেফাত লাভ সম্ভব হয় না এবং স্বীয় হাকীকতের বাহিরে কিছু লাভ করার কোন সুরত প্রকাশিত হয় না। যেমন কোন কবি বলেন ঃ

যার রা গর বস ওর বস্ বদ্‌বুদ্
গরচে উম্‌রে তাগ্ যানাদ দর খোদ্‌বুদ্,

নিকৃষ্ট অনু চায় যেতে কোন্ ঠিকানায় ?
তামাম জীবন ঘুরেও দেখে সে যে নিজ আঙ্গিনায়।

হজরত খাজেগানদের খাজা, হজরত বাহাউদ্দিন কাদ্দাসাল্লাহু সিরুহুল আকদাস[১] এই বক্তব্যের ইংগিত করিয়া বলেন, ফানা এবং বাকা লাভের পর আহলুল্লাহগণ যাহা দেখেন, উহা নিজেদের মধ্যেই অবলোকন করেন এবং যাহা কিছু চিনেন, উহা নিজেদের মধ্যেই চিনেন। যেমন আল কুরানের ভাষায়- 'ওয়া ফি আনফুসিকুম আ-ফালা তুবসিরুন' (আর তিনি তো তোমাদের নফসের মধ্যেই তোমরা কি তাহা দেখ না?' আর এ ধরনের মারেফাত বাস্তবে আশ্চর্যজনকই হইয়া থাকে।

হজরত যুননুন মিসরী কাদ্দাসাল্লাহু তায়ালা সিররাহু[২] বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যাতের মধ্যে মারেফাত কেবলমাত্র আশ্চর্যজনক! অন্য একজন বুজর্গ বলেন, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌তায়ালার অধিক পরিচয় লাভকারী, যাহার বিস্মিত অবস্থা তাঁহার যাতের মধ্যে সমধিক। যদিও অধিকাংশ মাশায়েখ কাদ্দাসাল্লাহু আসরারাহুম, যাতে হকের মারিফাতের মধ্যে, তাহাদের বক্তব্যকে সুষ্ঠুভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু এই ফকিরের (অর্থাৎ হজরত মুজাদ্দিদ র. এর নিকট মারেফাতে সিফাতের অর্থও সিফাতের মধ্যে আশ্চর্যান্বিত হওয়া। যেমন এই সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

---

১. তিনি নকশবন্দীয়া তরীকার ইমাম। পেশার কারণে বা আল্লাহর নামের নকশা দিলের মধ্যে বসানোর কারণে তিনি নকশবন্দ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার কারণেই এই তরিকাকে নকশবন্দীয়া তরিকা বলা হয়। বাহ্যতঃ তিনি হজরত আমীর কুলাল র. হইতে ফয়েজ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অপ্রকাশ্যতঃ হজরত আবদুল খালিক গাজদাওয়ানী র. হইতে ফয়েজ লাভ করেন। তিনি ৭১৮ হিজরীতে বুখারার নিকটবর্তী কাসরে আরেফান নামকস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৭৩ বৎসর বয়সে, ৭৯১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

২. হজরত যুননুন মিসরীর র. কুনিয়াত ছিল, আবু আব্দুল্লাহ এবং তাঁহার নাম ছিল ছাওবান ইবনে ইব্‌রাহীম। তিনি ইমাম মালিকের র. শিষ্য ছিলেন এবং আহলে সালামতীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। যাহা হউক, তিনি বিশিষ্ট মাশায়েখদের অন্যতম হিসাবে পরিচিত। তিনি কঠোর সাধনাকারী এবং কাশফ ও কারামতধারী ওলী ছিলেন। তিনি ২৪০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মাযার মিশরে অবস্থিত, যাহার গায়ে উৎকীর্ণ আছেঃ যিননুন হাবীবুল্লাহ মিনাশ শাওকে কাতীলুল্লাহ।



আল্লাহ্তায়ালার ওজুদের (অস্তিত্বের) ব্যাখ্যাঃ অধিকাংশ দার্শনিকদের মতানুযায়ী আল্লাহতায়ালার ওজুদ তাঁহার পবিত্র যাতের উপর অতিরিক্ত এবং বিজ্ঞ আলিম শায়েখ আবুল হাসান আশআরী[১] র. এবং কিছু কিছু সুফীদের নিকট এই ওজুদ হইল আয়নে যাত (মূল সত্তা)। আর এই ফকীরের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত হইল, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার যাতের (সত্তার) সহিত মওজুদ (বিদ্যমান), ওজুদের সহিত নয়। আর ইহা অন্যান্য সৃষ্টির বিপরীত, কেননা উহারা ওজুদের সহিত বিদ্যমান। আর যে ওজুদ যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত উহা জ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টবস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ জ্ঞান অজুদের যাত হইতে মওজুদের গুণকে বাহির করিয়া যাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। আর দার্শনিকদের মতানুযায়ী, যদি অতিরিক্ত ওজুদ হইতে, ইহা বহিষ্কৃত ওজুদ হয়; তবে তাঁহাদের অভিমত সত্য এবং ইহাতে মতানৈক্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর যদি তাহারা এইরূপ ওজুদের অর্থ গ্রহণ করে, যাহার সহিত আল্লাহ্তায়ালা মওজুদ, যেমন বাহ্যতঃ তাঁহাদের বক্তব্য হইতে জানা যায়, তবে এমতাবস্থায় ইহা চিন্তার বিষয়। আর যদি বিজ্ঞ-আলিম শায়েখ আবুল হাসান আশবারী এবং কিছু কিছু সুফী যাঁহারা আল্লাহতায়ালাকে তাঁহার যাতের সহিত মওজুদ বলেন, ওজুদকে অস্বীকার করেন এবং তাঁহাকে আয়নে-যাত বলেন এমতাবস্থায় যে, তাহারা কোন দলীল-প্রমাণের ধার ধারে না, তবে তাহাদের বক্তব্য সঠিক।

---

১. তিনি আশারিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং দর্শন শাস্ত্রের জনক। তিনি ২৬০ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরে তাঁহাদের সহিত মতবিরোধ ঘটায় তিনি শাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দীনের মাসলা মাসায়েলকে দার্শনিক ভংগীতে জোরালো ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় তিনশত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে “মাকালাতুল ইসলামীন” গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ৩২৪ হিজরীতে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

<u>সুফীদের অবস্থার উপর বিস্ময় সম্পর্কে ঃ</u> আর ঐ সমস্ত সুফীদের উপর বিস্ময় এই জন্য যে, তাঁহারা যাতে হক জাল্লা শানুহুর মধ্যে সমস্ত নিসবতকে (সম্পর্ককে) পরিত্যাগ করেন এবং উহাকে তানাযযুলাতের (অবতরণের) হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা ওজুদকে যাতের মরতবায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আর বাহ্যত ইহা পরস্পর বিরোধী অভিমত ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার জবাবে এরূপ বলা উচিত নয় যে, ঐ সমস্ত হজরত তো ওজুদ কে আয়নে-যাত বলেন, কিন্তু তাঁহারা উহাকে নিসবতের মধ্যে গণ্য করেন না। ইহার জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, আয়নিয়াত বাহ্যিক-দৃষ্টিতে, অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে নয়। আর ঐ সমস্ত হজরতদের নিকট সিফাত (গুণাবলী) এই ধরনের, যাহা জ্ঞানের দৃষ্টিতে তো আলাদা এবং বিপরীত, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাতের অনুরূপ। কেননা তাহাদের নিকট একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার যাত ব্যতীত আর কোন কিছুই মওজুদ নাই। এমতাবস্থায় ইহা আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা ঐ সমস্ত সিফাতকে যাতের মরতবার সহিত প্রতিষ্ঠিত করেন, আর এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত বৈ কিছুই নয়। আর তাহারা নিজেরাই ইহার বিপরীত মতের ধারক বাহক, যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

প্রশ্নঃ যদি সমস্ত হজরত বলেন, যাতের অর্থ হইল অহ্দাত (একত্ব) যাহা হইল প্রথম-তা'আয়্যুন (নির্ধারণ), এমতাবস্থায় তাঁহারা নির্ধারিতের উপর, নির্ধারণের অতিরিক্ত হওয়ার দিকে খেয়াল করেন নাই। আর এই অবস্থায় তাঁহারা অন্য সব নিসবতকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ওজুদকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা, উহাদের স্তর অহেদিয়াত (এককত্বের) পর্যায়ের, যাহার স্থান অহদাতের এক কদম নিচে।

উত্তরঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে, তাঁহাদের এই সমস্ত উক্তি, দার্শনিকদের সহিত মিলে না। কেননা, দার্শনিকদের মতানুসারে যাতের অর্থ হইল নিছক যাত যাহা সমস্ত তা'আয়্যুনের ঊর্ধ্বে এবং তাঁহারা ওজুদকে ঐ যাতের উপর অতিরিক্ত মনে করেন। আর যে পার্থক্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে, উহা এই অতিরিক্তকে দূরীভূত করিতে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। আসলে অতিরিক্ত তো অতিরিক্তই, চাই উহা প্রথম মরতবায় হউক বা দ্বিতীয় মরতবায়। আবুল মুকারাম রুকনুদ্দীন[১] শায়েখ আলাউদ্দৌলা সামনাতী র. বলেন, মহব্বতকারী বাদশাহের (আল্লাহের) দুনিয়া, এই ওজুদ বিশিষ্ট দুনিয়ার উপরে অধিষ্ঠিত। এই বক্তব্যে ইহা প্রতীয়মান হয় যে; ওজুদ, যাত হইতে আলাদা। সংক্ষেপে বলা যায়, যদি আল্লাহ্তায়ালাকে তাঁহার স্বীয় যাতের সহিত মওজুদ বলা হয় এবং অন্য কোন নতুন ওজুদের কথা না বলা হয়; তবে ইহাই অতি উত্তম ও উৎকৃষ্ট। আর যদি ওজুদের কথা বলা হয়, এমতাবস্থায় অবশ্যই যাত ও ওজুদের

---

১. তাহার কুনিয়াত ইহল আবুল মুকরাম এবং নাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ। তিনি ৬৫৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৭ হিজরীতে শায়েখ নুরুদ্দীন আবদুর রহমান কিসবাতের নিকট বাগদাদে মুরীদ হন। তিনি ২২শে রজব ৭৩৬ হিজরীতে ৭৭ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

মধ্যে বৈপরীত্য মানিতে হইবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দার্শনিকদের বক্তব্য, তাঁহাদের বিরোধী মতাবলম্বীদের বক্তব্য হইতে অধিক সহীহ্ এবং বাস্তবের নিকটবর্তী।

ওজুদের-বেদয়িহী[২] এবং নযরী[৩] হওয়া সম্পর্কেঃ এখন এই সম্পর্কের আলোচনা বাকী আছে যে, আল্লাহ্তায়ালার ওজুদ বেদয়িহী না নযরী। অধিকাংশ দার্শনিকদের মতে ইহা হইল– নযরী। অপরপক্ষে, ইমাম গাযযালী এবং ইমাম রাযী[৪] র. উহা বেদয়িহী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। অবশ্য পরবর্তীকালের কোন কোন বুজর্গ, এই দুইটি বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য বলিয়াছেন, কিছু কিছু লোকের নিসবতে ইহা বেদয়িহী এবং অন্য কিছু লোকের নিসবতে ইহা নযরী। আর এই ফকীরের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ মত এই যে, উহা আসলে বেদয়িহী এবং কিছু লোকের দৃষ্টিতে ইহা গুপ্ত থাকার কারণে, উহার বেদয়িহী হওয়াতে আদৌ কোন বাঁধা নাই। কেননা, বেদয়িহী হওয়ার জন্য ইহা আবশ্যক নয় যে, সকলেই উহাকে জানিবে। বরং দেখা যায়, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রকাশ্য বেদয়িহী বস্তুকে অস্বীকার করিয়াছেন। আর এই সমস্ত হজরত, আল্লাহ্তায়ালার ওজুদ সম্পর্কে যে সমস্ত দলিল আনিয়াছেন; ঐ সমস্তই তাঁহার বেদয়িহী হওয়ার প্রমাণ। যেমন, কোন কিছুকে স্পর্শের দ্বারা বোঝার জন্য শর্ত হইল স্পর্শ অনুভূতির বাহ্যিক আপদ হইতে নিরাপদ ও সুস্থ হওয়া। আর উহা আপদগ্রস্ত থাকায় উহার দ্বারা কিছু অনুভব করিতে না পারা, ঐ অনুভূত বস্তুর বেদয়িহী হওয়ার জন্য কোন বাঁধা হয় না। একই ভাবে, জ্ঞানের দ্বারা যাহা কিছু অনুভূত হয় উহার জন্য শর্ত হইল- ঐ শক্তির সর্বপ্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রোগ হইতে মুক্ত ও নিরাপদ হওয়া। আর কোন কারণ বশতঃ উহা অনুভব না করা, ঐ বস্তুর জন্য কোন বাধা হয় না। যে জামাত উহাকে বেদয়িহী হওয়ার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, হক সুবহানুহু তায়ালা তাঁহাদের সম্পর্কে বলেন- 'তাহাদের রাসুলগণ বলেন, আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে?' বস্তুতঃ এই বক্তব্যটি কোন কোন স্বল্পবোধ ব্যক্তিদের নিকট স্পষ্ট ছিলনা। কাজেই তাহাদের জন্য পরে জলদগম্ভীরস্বরে ঘোষিত হইয়াছে, তোমাদের কি সেই আল্লাহ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা?

---

২. ঐ বস্তু যাহাকে জানার জন্য চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হয় না,

৩. ঐ ইলম বা জ্ঞান, যাহা আমলের সহিত সম্পর্ক রাখে না; দর্শনীয় অস্তিত্ব।

৪. আবুল ফযল মোহাম্মদ বিন আমর বিন হোসায়েন, যিনি ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী র. হিসাবে প্রসিদ্ধ; ৫৪৩ হিজরীতে 'রায়' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার দেশেই লাভ করেন এবং পরে তিনি ইমাম শাফী র. ও আশায়েরাদের অনুসারী হন এবং মুতাযিলাদের সহিত মুকাবিলার উদ্দেশ্যে খাত্তারযিম নামক স্থানে গমন করেন। অতঃপর তিনি বুখারা, সমরখন্দ, গযনী, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ শেষে, 'হিরাত' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে তিনি শিক্ষাদানে রত থাকেন এবং অসংখ্য ছাত্রকে তাঁহার জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন। অবশেষে তিনি ৬০৬ হিজরীতে, হিরাতেই ইনতিকাল করেন।



আহলে-হক (সত্যাশ্রয়ী দল) সিফাতের অস্তিত্বের স্বীকার করেন এবং উহার ওজুদকে যাতের ওজুদের উপর অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য করেন। তাঁহারা হক তায়ালা সুবহানুহুকে ইলমের সহিত আলিম এবং কুদরতের সহিত কাদির হিসাবে জানেন। ইহার উপর অন্যান্য সিফাতেরও ধারণা করা যায়। অপরপক্ষে, মুতাযিলা, শিয়া এবং দার্শনিকগণ, সিফাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যে বস্তু সিফাতের উপর প্রকাশ পায়, উহা যাতের উপরও প্রকাশিত হয়। যেমন, মখলুকাতের মধ্যে বস্তুর প্রকাশ, সিফাতে ইলমের দ্বারাই হইয়া থাকে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে উহার প্রকাশ, যাতে হকের উপরই নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিতে যাত হইল ইলমের হাকীকাত এবং একইরূপ কুদরত ও অন্যান্য সিফাতের অবস্থা। আর পরবর্তীকালীন সুফীদের কেহ কেহ যাঁহারা অহদাতুল ওজুদের সমর্থক, তাঁহারা সিফাতের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের দিক দিয়া মুতাযিলা এবং দার্শনিকদের সাথে একমত।

প্রশ্নঃ এখন যদি কেহ বলে, উপরোক্ত সুফীগণ সিফাতকে জ্ঞানের ও বুঝের মধ্যে আসার কারণে 'গায়ের যাত' বলেন এবং বাহ্যতঃ উহার অস্তিত্ব থাকার কারণে 'আয়নে যাত' (মূল সত্তা) বলেন। কাজেই, তাঁহাদের মাযহাবের মধ্যে এবং দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাযহাবের মধ্যে একটি সম্পর্ক হইবে। কেননা, জ্ঞানীগণ সিফাতকে সরাসরি আয়নে যাত বলেন এবং দার্শনিকগণ উহাকে সরাসরি গায়ের যাত হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আর ইহারা, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়নে যাত বলেন এবং অর্থের দৃষ্টি বা অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে গায়ের যাত বলেন।

উত্তরঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য হইল- আমি একথা স্বীকার করি না যে, জ্ঞানীগণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সিফাতের অস্তিত্ব থাকার কারণে, উহাকে আয়নে যাত বলেন। বরং সমস্ত প্রকার মতানৈক্যের কারণ হইল ওজুদে খারিজী (বহিঃর্জগত),

ওজুদে যিহনী (মনোজগত) নয়। মাত্তাকিফ[১] গ্রন্থের প্রণেতা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দার্শনিকগণ সিফাতকে যাতের উপর একটি অতিরিক্ত ওজুদের সহিত বাহিরে মওজুদ হিসাবে মনে করেন এবং হুকামা ও মুতাযিলাগণ সিফাতকে বাহ্যতঃ আয়নে যাত হিসাবে ধারণা করেন। উপরে বর্ণিত সুফীরাও এই ব্যাপারে হুকামা ও মুতাযিলাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইহারা এই ব্যাপারে উপরোক্ত মতানৈক্য হইতে নিজেদেরকে হুকামা ও মুতাযিলাদের হইতে আলাদা করেন এবং সিফাত না হওয়াকে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মতানৈক্যের কারণে তাঁহাদের আদৌ কোন ফায়দা হাসিল হয় না।

তাঁদের দলনেতার উক্তিঃ কিছু লোক সিফাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন; কিন্তু আম্বীয়া ও আউলীয়াদের রুচী ইহাদের বিপরীত সাক্ষ্য দান করে। আর কিছু লোক সিফাতের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত হইল- উহা যাত হইতে সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য পরিষ্কার কুফরী এবং নির্ভেজাল শিরক ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিছু লোকের অভিমত হইল- যাহারা যাতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং সিফাতকে অস্বীকার করে– তাহারা হইল মূর্খ এবং বিদআতী। আর যাঁহারা এরূপ সিফাতের স্বীকারকারী, যাহা যাতের সম্পূর্ণ বিপরীত, এমতাবস্থায় ইহারা দুই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও কাফির এবং ইহারা তাহাদের কুফরীর সহিত মূর্খও।

এই আলোচনা সরাসরি ইতিবাচক ও নেতীবাচকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে। যাঁহারা ইহাকে সরাসরি অস্বীকার করেন, তাঁহারা হইলেন ওলামা; আর যাঁহারা ইহাকে সরাসরি স্বীকার করেন, তাঁহারা হইলেন– দার্শনিক। বস্তুতঃ জানা গিয়াছে যে, এই মাযহাব, উক্ত দুইটি মাযহাবের সহিত আদৌ সম্পর্কিত নয়; বরং ইহারা নিজেরাই অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুফীদের বক্তব্য খণ্ডনঃ তাঁহাদের এইরূপ সাহসের কারণে আশ্চর্যবোধ হয় যে, তাঁহারা স্বীয় কাশফের উপর ভরসা করিয়া, এমন একটি বিশ্বাস করিয়াছেন; যাহা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ঐক্যমতকে বাতিল প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর তাঁহারা এই ধরনের বিশ্বাসীদেরকে কাফির ও ছানুবী (দুই আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী) হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যদিও তাহারা কুফর ও ছানুবীয়াত শব্দের

---

১. মাত্তাকিফ হইল দর্শন শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং সাহেবে মাত্তাকিফের অর্থ হইল ঐ গ্রন্থের প্রণেতা, আল্লামা আযদুদ্দীন আবদুর রহমান। এই গ্রন্থের টিকাকার হইলেন আল্লামা সাইয়েদ আল শরীফ আলী ইবন মুহাম্মদ জুরজানী র. (মৃত্যু ৮১৬ হিজরী), যাহা শরহে মাত্তাকিক হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত। এই শরাহের উপর আবার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, মোল্লা আবদুল হামিদ শিয়াল কোটি র.।

দ্বারা প্রকৃত কুফর ও ছানুবীয়াতের অর্থ গ্রহণ করেন নাই; তথাপিও একটি সঠিক মতামতের বিশ্বাসীদের সম্পর্কে মুখ হইতে এমন শব্দ উচ্চারণ করা, বড়ই অপছন্দনীয় এবং খুবই খারাপ। তাঁহারা কাশফের মধ্যে কতই না ভুল করেন; কিন্তু তাঁহারা এতটুকু অনুধাবন করেন না যে; হয়তো এতদসম্পর্কীয় কাশফটি ভুলও হইতে পারে এবং উহা সঠিক মতবাদের সহিত আদৌ মুকাবিলা করার সামর্থ্য রাখে না।

একটি বিশেষ বক্তব্যঃ উক্ত বিষয় সম্পর্কে এই ফকীরের একটি বিশেষ বক্তব্য আছে এবং উহা হইল হক-তায়ালা সুবহানুহুর যাত-ই, ঐ সমস্ত কাজের মধ্যে যাহা সিফাতের উপর মতারত্তব (বর্তায়) হয়; যথেষ্ট। ইহা এই অর্থে নয়, যাহা বিচক্ষণ আলিমগণ বলিয়াছেন যে, বস্তুর প্রকাশ, যেমন– (মাখলুকাতের মধ্যে) সিফতে ইলমের উপর নির্ভরশীল; কাজেই উহা (আল্লাহ্‌র মধ্যে) যাতের উপরই নির্ভরশীল। বরং এই অর্থে যে, যাতে হক জাল্লা শানুহু এমনই পরিপূর্ণ যাত যে, উহা সব কাজই সম্পন্ন করে। অর্থাৎ যে কাজ জ্ঞানীদের করা উচিত, যাতে হক জাল্লা শানুহু সিফতে ইলম ব্যতীতই ঐ কাজ সম্পন্ন করেন। একইভাবে, যে জিনিস সিফাতে কুদরতের প্রভাবে প্রকাশিত হয়, যাতে হক ঐ জিনিসের ক্ষেত্রে ঐ সিফাত ব্যতিরেকেও সামর্থ্যবান। একটি উদাহরণঃ আমি এখানে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি, যাহা সহজে বোধগম্য হইবে। যেমন একটি প্রস্তরখণ্ড, যাহা তাঁহার স্বাভাবিক দাবী অনুসারে উপর হইতে নিচের দিকে আসে। উহার যাতই ইল্‌ম, কুদরত ও ইরাদার কার্য সম্পন্ন করে, যদিও উহার মধ্যে ইল্‌ম, কুদরত ও ইরাদার সিফাত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ইলমের দাবী এই যে, ভারী প্রস্তরখণ্ড হওয়ার কারণে, উহা নিচের দিকে আসিবে এবং উপরের দিকে যাইবে না। ইরাদা হইল ইলমের অনুসারী। আর ইরাদার দাবী এই যে, উহা নিচে আসার জন্য প্রাধান্য দিবে। আর হরকত হইল কুদরতের প্রেক্ষিত। বস্তুতঃ প্রস্তরখণ্ড স্বভাবতঃই, উহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া এই তিনটি সিফাতের কাজ সম্পন্ন করে।

কাজেই, আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে, 'আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য তো সুউচ্চ মিছাল আছে' (আল কোরআন)। তাই তাঁহার যাতও উহার মতো সমস্ত সিফাতের কার্যাবলী সম্পন্ন করে। আর এই কাজগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার সিফাতের কোন প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু প্রকাশ, প্রভাব এবং বৈশিষ্ট ইলম, কুদরত এবং ইরাদার সিফাতের উপর প্রযোজ্য হয়। তিনি জ্ঞানী, ইলমের সহিত। যাতের সহিত নন। তিনি কুদরতের সহিত প্রভাবশীল এবং ইরাদার সহিত বৈশিষ্টমণ্ডিত।

অবশ্য এখানে একটি কথা আছে যে, যাহা কিছু ঐ সিফাতের সহিত করা হয়, যাতে হক জাল্লা শানুহু উহার মধ্যেই যথেষ্ট। কিন্তু এই অর্থটি, সিফাতের উপরই প্রযোজ্য। যাতকে এই অর্থ ব্যতীত পাওয়া গেলে, উহাকে আলিম, কাদির এবং

ইরাদার অধিকারী বলা যাইবে না। উদাহরণতঃ ঐ প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে যদি ইল্‌ম, কুদরত এবং ইরাদার সিফাতের অস্তিত্ব প্রদান করা হয়, তবে উহাকে সাহেবে ইল্‌ম, সাহেবে কুদ্‌রত এবং সাহেবে ইরাদা বলা যাইবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত অর্থের অস্তিত্ব ব্যতীত, তিনি এই সমস্ত সিফাতে বিভূষিত হন না, যদিও তিনি নিজে এই সিফাতের কার্যাবলী সম্পন্ন করেন। আর এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তাঁহার মধ্যে এই অর্থের অস্তিত্ব, তাঁহার পূর্ণতারই প্রমাণ।

কাজেই, আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য যাতে আয্‌যা সুল্‌তানুহু ঐ সমস্ত জিনিসের জন্য যথেষ্ট, যাহা সিফাতের উপর প্রযোজ্য হয়। কিন্তু নিজের ঐ পূর্ণ অর্থের প্রতিষ্ঠার জন্য সিফাতের প্রয়োজন। আর যাতে হক জাল্লা শানুহু, এই অর্থ প্রাপ্তির কারণে, সিফাতে কামালের (পরিপূর্ণ গুণের) অধিকারী হন।

অভিযোগঃ এখানে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা উচিত নয় যে, এই সিফাতের সহিত (যাহা যাতে হকের বিপরীত) যাতে হকের পূর্ণতার জন্য আবশ্যকীয় হয়। ইহার দ্বারা যাতের মধ্যে অপূর্ণতা আসা এবং গায়ের যাতের সহিত মিশ্রণের ফলে, তাঁহার পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং এধরনের বক্তব্য অসম্ভব মাত্র।

উত্তরঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য হইল, হক তায়ালার জন্যে অন্যের নিকট হইতে সিফাতে কামালের জন্য উপকার গ্রহণ করা অবাস্তব। তাঁহার স্বয়ং সিফাতে কামালের গুণে বিভূষিত হওয়া অসম্ভব নয়, যদিও এ সফিাত যাতের বিপরীত হয়। আর দার্শনিকদের মাযহাব অনুযায়ী, দ্বিতীয় সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী হয়, প্রথম সন্দেহ নহে। যেমন এ সম্পর্কে সাইয়েদ সানাদ র. শরহে মাত্তাকিফে যুক্তি সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন।



<u>যাত ও সিফাতের বেচুঁ হওয়া সম্পর্কেঃ</u> হক তায়ালা স্বীয় যাত ও সিফাতে অতুলনীয়। তাঁহার যাত এবং সিফাত, মাখলুকাতের যাত এবং সিফাত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোনভাবেই উহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই, হক সুবহানুহু "মিছাল" হইতে অর্থাৎ কোন কিছুর অনুরূপ হইতে পাক

এবং পবিত্র। একইভাবে "নিদ", অর্থাৎ বিপরীতে কোন কিছুর সহিত তুলনীয় হইতেও পাক। হক তায়ালা শানুহুর মাবুদ হওয়া, ছানে হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে অন্য কিছুই শরীক নয়।

আর কিছু সংখ্যক সূফী, যাঁহারা অহ্‌দাতুল– ওজুদের সমর্থক; তাঁহারা মওজুদ হওয়াতেও শরীকের অস্বীকার করেন এবং হক তায়ালা ব্যতীত আর কোন বস্তুকে মওজুদ হিসাবে স্বীকার করেন না। তাঁহারা এতদসম্পর্কে যে দলীল পেশ করেন, উহা হইল– কাশ্‌ফ। আর ইহা গোপন নয় যে, এই বক্তব্যের ফলশ্রুতিতে দ্বীনের অনেক নিয়ম কানুন বিনষ্ট হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাঁহারা এই বক্তব্যের দ্বারা, দ্বীনের কিছু কিছু নিয়ম কানুনের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য লৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এ ধরনের কাজে সমালোচনার অবকাশ আছে। আর তাঁহাদের কিছু নিয়মকানুন এমন আছে, যাহা আদৌ উপযোগী নয়। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতের অস্বীকার সম্পর্কীয় আলোচনা।



মাকান, যামান (স্থান ও কাল) এবং উহাদের আবশ্যকীয়তা হইতে পবিত্রতা সম্পর্কেঃ হক তায়ালা সুবহানুহুর অবস্থান কোন দিকে নয় এবং তিনি মাকানী ও যামানী নন। অবশ্য হক তায়ালার এই ইরশাদঃ মেহেরবান আল্লাহ্‌ আরশের উপর অবস্থিত (সুরা তাহা), যদিও বাহ্যতঃ এই আয়াতে বিশেষ স্থান ও দিকের ধারণা সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দিক ও স্থানের অস্বীকারকারী। কেননা, উক্ত পবিত্র আয়াতে দিক স্থানের নির্দেশ এমন মাকামের (আরশের) প্রতি করা হইয়াছে, যেখানে আদতে কোন দিক বা স্থান নাই। বরং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার বে-মাকানী এবং বে-জেহতী (দিকশূন্যতা) হওয়ারই ইংগিত বহনকারী। ইহা উত্তমরূপে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আর তিনি জিস্‌মানীও নন এবং জওহর এবং আরজও নন। এক কথায়, তাঁহার দিকে কোন কিছু ইশারা বা ইংগিত করাও সমীচীন নয়। হরকত এবং পরিবর্তনের কোন ধারণা করাও তাঁহার জন্য উচিত নয়। তাঁহার

যাতে কাদীমের (চিরস্থায়ী সত্তার) সহিত হাওয়াদেছের (অস্থায়ীত্বের) অবস্থান ও বৈধ নয়। তিনি আরাযে মাহ্সূসা ও আরাযে মাকূলার (অনুভব ও বোধের বিষয়ের) মধ্যে কোন আরযের গুণে গুণান্বিত নন। আর না তিনি আলমের মধ্যে এবং না উহার বাহিরে। আর নন তিনি আলমের সহিত মিলিত এবং নন উহা হইতে বিচ্ছিন্ন। আলমের সহিত তাঁহার সম্পর্ক জ্ঞানগত যাতী নয়। আর তিনি যে সৃষ্টিজগতকে ঘিরিয়া আছেন, ইহাও জ্ঞানগত-যাতগত নয়। তিনি কোন জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করেন না এবং কোন জিনিসের সহিত মিলিতও হন না।

প্রশ্নঃ এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন, কোন কোন সূফীগণ যে যাতী মায়ীআত (সত্তাগত সঙ্গতা) এবং ইহা তার (বেষ্ঠন) কথা বলেন, ইহার অর্থ কি?

উত্তরঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত হযরতগণ যাতের অর্থ প্রথম তাআয়্যুন গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাকে অহ্দাত বলা হয়। কেননা, তাঁহারা এই অবস্থাকে যাতে হক জাল্লা শানুহুর উপর অতিরিক্ত হিসাবে মনে করেন না। তাই তাঁহারা এই অবস্থার প্রকাশকে তাজাল্লীয়ে যাতী হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং এই তাআয়্যুনকে সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশকারী হিসাবে মনে করেন। যাহার ফলশ্রুতিতে তাঁহারা ইহাকে যাতী মায়ীআত ও ইহাতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। মুতাকাল্লেমীন হযরতগণ (আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন), যাতের দ্বারা, নিছক যাতের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা সমস্ত তাআয়্যুনাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর। আর এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, এ যাতের আলমের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। উহা ইহাতা, মায়ীআত ইত্তেসাল (মিলিত হওয়া) এবং ইনফিসাল (পৃথক হওয়া) যাহাই হউক না কেন। হক তায়ালা শানুহু কোন প্রকারেই জ্ঞানের আওতায় আসেন না এবং সবদিক হইতে তিনি অজ্ঞাত অবস্থা স্বরূপ। তাঁহাকে মিলিত, বিচ্ছিন্ন, আচ্ছন্নকারী এবং অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদিরূপে আখ্যায়িত করা, মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। মুতাকাল্লেমীন ও অন্যান্যরা এই ব্যাপারে একমত। কিন্তু মুতাকাল্লেমীনদের দৃষ্টি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের নূরের সুরমায় আপ্লুত। সূফীদের দৃষ্টি যাতের ইহাতার সমর্থক। উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য আছে। সূফীদের অনুভূতির প্রধান উৎস হইল কাশ্‌ফ। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অনুভূতির আন্দাজে ফয়সালা দিয়াছেন। বস্তুতঃ মুতাকাল্লেমীন এবং পরবর্তীকালীন সূফীদের মধ্যে যে সমস্ত মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, ইহাতে হক মুতাকাল্লেমীনদের মতই সঠিক। তাই সূফীদের দৃষ্টি এখানে পরিসীমিত। তাঁহারা মুতাকাল্লেমীনদের বক্তব্যের হাকীকত অনুধাবন করিতে সক্ষম হন নাই।



মারেফত আঠার

<u>মালুমের (অনুভূতির) সহিত ইলমে হকের (সত্য জ্ঞানের) সম্পর্ক</u>ঃ হক সুব্‌হানুহু তায়ালা এমন একটি ইলমের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহা তাঁহার যাতের অতিরিক্ত এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনি জ্ঞানী; চাই সে জ্ঞান মালুমে ওয়াজিব হউক অথবা মুম্‌কিন। আর ইলম হইল জানার সহিত সম্পর্কিত একটি হাকিকী সিফাত, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত এই সিফাতটির সম্পর্ক কিরূপ, উহা অজ্ঞাত। যেমন, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। একইরূপে, ইহাও জানা যায় না যে, জ্ঞাত বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি? কেবলমাত্র এতটুকু জানা যায় যে, এই সম্পর্ক, জ্ঞাত বিষয়ের প্রকাশের কারণ স্বরূপ হয়। অধিকাংশ লোক, ইহার হাকীকত সম্পর্কে অবহিত না হওয়ায় গায়ের (অনুপস্থিত)কে হাজিরের (উপস্থিত) উপর ধারণা করিয়াছেন, যাহার ফলশ্রুতিতে তাঁহারা সন্দেহ ও পেরেশানীতে পতিত হইয়াছেন।



মারেফত উনিশ

<u>কুদরত এবং ইরাদা (শক্তি ও ইচ্ছা) সম্পর্কে</u>ঃ কুদরত এবং ইরাদা হক-তায়ালা শানুহুর যাতের উপর অতিরিক্ত সিফাত (গুণ)। আর কুদরতের অর্থ হইল-হক তায়ালার জন্য সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করা এবং না করা উভয়ই সঠিক। এই সৃষ্টি করা এবং না করা, কোনটাই হক তায়ালার যাতের জন্য আবশ্যকীয় নয়। সমস্ত মাযহাবের অনুসারীরা এই ব্যাপারে একমত।

কিন্তু দার্শনিকগণ বলেন, সৃষ্টি জগৎকে বর্তমান আইনের অধীনে সৃষ্টি করা, যাহার উপর ইহা চলিতেছে, হক তায়ালা সুবহানুহুর যাতের অন্যতম দাবী। একইরূপে, তাঁহারা কুদরত সর্ম্পকীয় উপরে বর্ণিত অর্থ অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহাদের ধারণা এই যে, উপরোক্ত অর্থের দৃষ্টিতে কুদরত একটি অসম্পূর্ণ শক্তি। তাঁহারা মনে করেন, আল্লাহ্তায়ালার জন্য সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করা অবশ্য কর্তব্য এবং জরুরী। আর ইহাই তাঁহার জন্য পূর্ণতার পরিচায়ক। তাঁহারা কুদরতের এইরূপ অর্থও করেন- যদি তিনি চান, করেন। আর যদি তিনি না চান, তবে করেন না। আর এই দিক দিয়া তাঁহারা আহলে ইসলামদের সহিত একমত। কিন্তু প্রথম শর্তসূচক বাক্যটির (যদি তিনি চান, তবে করেন) প্রথম অংশটিকে (অর্থাৎ যদি তিনি চান), তাঁহারা ওয়াজিবুস্ সিদ্ক (প্রকৃতই অবশ্যম্ভাবী) হিসাবে মনে করেন। আর দ্বিতীয় শর্তসূচক বাক্যটির (যদি তিনি না চান, তবে করেন না) প্রথম অংশটিকে (অর্থাৎ যদি তিনি না চান), তাঁহারা মুম্তানিউস সিদক (প্রকৃতই অসম্ভব) হিসাবে মনে করেন। আর এই দুইটি শর্তসূচক বাক্যকে তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালা জন্য সত্য হিসাবে মনে করেন। বস্তুতঃ এই দার্শনিকরা ইরাদাকেও ইলমের উপর অতিরিক্ত হিসাবে মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, পরিপূর্ণ নিয়মের দৃষ্টিতে, ইরাদাই ইলমের আসল নাম। তাঁহারা তাঁহাদের পরিভাষায়, ইহাকে 'ইনায়েত' বলেন।

পরবর্তীকালের কোন কোন সূফীরা, কুদরতের এই অর্থে, দার্শনিকদের সহিত একমত। তাঁহারা দ্বিতীয় শর্তসূচক বাক্যটির (যদি তিনি না চান, তবে করেন না) প্রথম অংশটিকে (অর্থাৎ যদি তিনি না চান), মুমতানিউস্ সিদক হিসাবে মনে করেন। আর তাঁহারা তাঁহাদের মাযহাবকে দার্শনিকদের মাযহাব হইতে এইরূপে পৃথক করেন যে, দার্শনিকগণ ইরাদার সমর্থক এবং তাঁহারা উহাকে আসল ইলম হিসাবে মনে করেন। অপর পক্ষে, সূফীগণ উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ইরাদাকে ইলমের উপর অতিরিক্ত হিসাবে মনে করেন। আর এইভাবেই তাঁহারা হক সুব্হানুহুকে ইরাদার অধিকারী মনে করেন এবং উহাকে মওজেব (যাহার উপর সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করা ওয়াজিব) বলেন না। আর ইহা দার্শনিকদের মতের বিপরীত। কেননা, তাহারা ইজাবের (বাধ্য করণ) সমর্থক এবং ইরাদার অস্বীকারকারী।

একটি সন্দেহ এবং উহার অপনোদনঃ এই স্থানে এই ফকিরের একটি সন্দেহ আছে এবং উহা এই– দুইটি এমন বস্তু, যাহার উপর কুদরত হাসিল আছে; উহার

কোন একটিকে অস্তিত্ব বা অস্তিত্বের সহিত খাস্ করিয়া নেওয়ার নামই হইল ইরাদা। আর বাক্যের দ্বিতীয় অংশ যখন মুমতানিউস সিদক এবং প্রথম অংশ ওয়াজিবুস সিদক, এমতাবস্থায় ইরাদার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি? কেননা, কোন কিছুকে নির্ধারণ করা বা অগ্রাধিকার দেওয়া হইল ইরাদার আসল উদ্দেশ্য, দুইটি একই ধরনের বস্তুর জন্য হইতে পারে। কাজেই যেখানে এই ধরন নাই, সেখানে কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দিবার প্রশ্নই উঠে নাই। তাই সেখানে ইরাদাও নাই। এই জন্য যখন আলেমগণ উভয়ের একইরূপ হওয়াকে অস্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা ইরাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। বরং তাঁহারা ইহাকে উপকারবিহীন মনে করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আলেমগণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই, আলোচ্য সূফীয়ায়ে কিরাম, আলমের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বে এক না হওয়া সত্ত্বেও ইরাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং উহার দ্বারা আলেমগণ হইতে আলাদা হইয়া যান। আর ইহার ফলশ্রুতিতে তাঁহারা হক্ তায়ালা সুবহানুহুকে, ছাহেবে ইরাদা এবং মুখতার (ইচ্ছাময় ও একচ্ছত্র অধিপতি) হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এই বর্ণনার পার্থক্যে, তাঁহাদের কথাবার্তার মর্মার্থ প্রকাশ্য নয়। তাঁহাদের মাযহাব, আল্লাহ্তায়ালার ইখতিয়ারের (ইচ্ছার) অস্বীকার সম্পর্কে হুবহু ঐরূপ, যাহা আলেমগণের মাযহাব। আর তাঁহাদের ইরাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা কেবলমাত্র জবরদস্তি ও মনগড়া বিষয়। আল্লাহতায়ালাই হককে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনিই সত্য পথে পরিচালিত করেন।

প্রশ্নঃ যদি কেহ বলেন, উপরোক্ত সূফীগণ আলমের অস্তিত্বকে, হক তায়ালার সুবহানুহুর যাতের উপর আবশ্যক মনে করেন না। বরং তাঁহারা আলমের প্রকাশ আল্লাহ্তায়ালা হইতে ইরাদার সহিত বলিয়া মনে করেন।

উত্তরঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, যখন দ্বিতীয় শর্তসূচক বাক্যটির প্রথমাংশ, (অর্থাৎ সৃষ্টির ইরাদা না করা) অসম্ভব হয় এবং ওজুদে আলমের ইরাদা করা ওয়াজিব হিসাবে প্রতীয়মান হয়; এমতাবস্থায় ইরাদার জন্য (যাহা হইল দুইটি একই ধরনের বস্তুর একটিকে প্রাধান্য দান) ওজুদে আলমের মধ্যে কোন অধিকারই অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই অনর্থক উহার উপর ইরাদা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। আর এই ধরনের ইরাদার স্বীকারকারী আলেমগণও। কাজেই, এই ধরনের ইরাদার প্রতিষ্ঠা আবশ্যককে দূরীভূত করিবার জন্য কোনরূপ ফায়দা প্রদান করে না। আর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের দুইটি দিক একই ধরনের না হওয়ার ফলে, হক সুবহানুহু তায়ালার উপর ইজাব (বাধ্যতা) আবশ্যক হয়। যেমন, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।



শুয়ূন ও সিফাতের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কেঃ শুয়ূনাতের ইলাহী (আল্লাহ্তায়ালার শানসমূহ) হক জাল্লা শানুহুর যাতের শাখা এবং হক তায়ালার সিফাত ঐ শুয়ূনাতের প্রশাখা স্বরূপ। আর আস্মায়ে ইলাহী (আল্লাহ্তায়ালার নামসমূহ) যেমন খালিক এবং রায্যাক ইত্যাদি, ঐ সমস্ত সিফাতের প্রশাখা স্বরূপ। আর আফআল (কার্যকলাপ) ঐ আসমার প্রশাখা স্বরূপ। বস্তুতঃ সমস্ত সৃষ্টিজগতই, আফ্আলের পরিণতি স্বরূপ এবং আফ্আলের প্রশাখা সদৃশ। এ ব্যাপার আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত। কাজেই, জানা গেল যে শুয়ূন এক জিনিস এবং সিফাত আর এক জিনিস। আর বাহ্যতঃ শুয়ূন যাতের অনুরূপ এবং সিফাত বাহ্যতঃ যাতের উপর অতিরিক্ত।

যাঁহারা এই পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের ধারণা এই যে, শুয়ূনই হইল সিফাত। এ কারণেই তাঁহারা এইরূপ ফয়সালা করিয়াছেন যে, শুয়ূনই যেরূপ বাহ্যতঃ যাতের অনুরূপ হয়, একইরূপে সিফাতও যাতের অনুরূপ। বস্তুতঃ এইভাবে তাঁহারা সিফাতকে অস্বীকার করেন। কিন্তু আহলে হক এ মাসআলাটির ব্যাপারে ঐকমত্য যে, বাহ্যতঃ সিফাতের অস্তিত্ব যাতের উপর অতিরিক্ত। আল্লাহ্ই সত্য কথাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনিই সত্য পথের সন্ধান প্রদান করেন।



যাত ও সিফাতে হকের মধ্যে সাদৃশ্য না হওয়া সম্পর্কেঃ যেমন আল্লাহ্তায়ালার ইরশাদ, ‘তাঁহার (আল্লাহ্র) সাদৃশ্য কিছুই নাই, এবং তিনি সব কিছুই শ্রবণ করেন, দেখেন।’ হক তায়ালা সুবহানুহু অত্যন্ত সুদক্ষ বাগ্মির ভংগিতে, স্বীয় যাত

হইতে সাদৃশ্যতাকে দূরীভূত করিয়াছেন। কেননা, এই আয়াতে তিনি নিজের অনুরূপ বস্তুকে দূর করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে উদ্দেশ্য হইল, নিজের সাদৃশ্যকে দূরীভূত করা। বস্তুতঃ উদ্দেশ্য এই যে, যেমন তাঁহার সাদৃশ্যের সাদৃশ্য হয় না, তখন তাঁহার সাদৃশ্য হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। কাজেই ইংগিতের ভংগিতে, আসল সাদৃশ্যের মূলোৎপাটন করা হইয়াছে, কেননা ইহা সরাসরি বলার মুকাবিলায় অধিক শুদ্ধ। যেমন, ভাষা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত। আর উহার সাথেই, "তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন এবং দেখেন" ইরশাদ করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল- সিফাতী সাদৃশ্যতাকেও অস্বীকার করা। যেমন প্রথম অংশ, "তাঁহার (আল্লাহ্‌র) সাদৃশ্য কিছুই নাই" দ্বারা যাতী সাদৃশ্যতাকে অস্বীকার করা হইয়াছে।

উহার ব্যাখ্যা এই যে, হক সুবহানুহু-ই সামী (শ্রবণকারী) এবং বাসীর (দ্রষ্টা)। তিনি ব্যতীত আর কেহই সামী এবং বাসীর নন। এই অবস্থা অন্যান্য সিফাতেরও। যেমন- হায়াত, ইল্‌ম, কুদরত, ইরাদা এবং কালাম ইত্যাদি। বস্তুতঃ সৃষ্ট জীবের মধ্যে সিফাতের সূরত (আকৃতি) পাওয়া যায়, উহার হাকীকত নয়। যেমন, উদাহরণতঃ বলা যায়, ইল্‌ম একটি সিফাত, যদ্‌দ্বারা বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। আর কুদরতও একটি সিফাত, যদ্‌দ্বারা ক্রিয়াকর্ম এবং উহার পরিণতি প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ মাখলুকাতের মধ্যে এই সিফাত পাওয়া যায় না, বরং হক সুবহানুহু তায়ালা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা, মাখলুকাতের মধ্যে উহার বিকাশ সাধন করান। যদিও বিকাশ লাভের মূল উৎস সিফাতে ইল্‌ম উহার মধ্যে নাই। একইভাবে, তিনি উহাদের মধ্যে কাজেরও সৃষ্টি করেন, যদিও তাহাদের মধ্যে কুদরত সৃষ্টিতগতভাবে নাই। শ্রবণ এবং দর্শনকে ইহার উপর ধারণা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালাই মানুষের মধ্যে শ্রবণ ও দর্শনশক্তির সৃষ্টি করেন, যদিও সৃষ্টিগতভাবে উহাদের মধ্যে এইসব শক্তি নাই। একইরূপে, অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদির জীবন্ত নিদর্শন, উহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়, যদিও সে নিজে হায়াত রাখে না। তিনি মাখলুকাতের মধ্যে "কালাম"কে সৃষ্টি করেন, যদিও তাহারা কথা বলার শক্তি রাখে না।

মোদ্দাকথা এই যে, সিফাতের বহিঃপ্রকাশ, যাহা হক সুবহানুহু ওয়া তায়ালার সৃষ্টির কারণে, মাখলুকাতের মধ্যে প্রকাশিত হয়, উহার নিদর্শন মাত্র পাওয়ার কারণে তাহাদের উপর সিফাতকে প্রয়োগ করা হয়, যদিও তাহাদের মধ্যে সিফাতের হাকিকত অবশিষ্ট থাকে না। এইরূপ না হইলে তাহাদের সমষ্টি কয়েকটি স্থবির জড়বস্তু ব্যতীত তো আর কিছুই নয়। যেমন আল্লাহর বাণী- (হে নবী) 'তোমাকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এবং তাহারাও মৃত্যুবরণ করিবে।'

একটি উদাহরণঃ এই আলোচনা একটি উদাহরণের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যেমন আমি বলি, কোন ক্রীড়াকুশলী ব্যক্তি, কাঠ বা কাগজ দিয়া মূর্তি তৈরি করে। অতঃপর সে পর্দার অন্তরালে বসিয়া উহাকে আন্দোলিত করে, যাহার ফলশ্রুতিতে উহার দ্বারা আশ্চর্যজনক নর্তন কুর্দন প্রকাশ পায়। সাধারণ লোকেরা অনুধাবন করে যে, মূর্তিটি স্বীয় ইচ্ছা ও অভিব্যক্তি অনুযায়ী নড়াচড়া করিতেছে। বস্তুতঃ প্রকাশ্যতঃ উহার নড়া চড়া এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, উহার মধ্যে কুদরত ও ইরাদার অস্তিত্ব মওজুদ আছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, উহার মধ্যে কুদরত ও ইরাদার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একইরূপে সন্দেহেরও সৃষ্টি হইতে পারে যে, সে জীবনও রাখে, কেননা তন্মধ্যে জীবনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ এই ধারণাও ইহতে পারে যে, ইলমও রাখে, কেননা ইরাদা তো ইলমেরই অনুসারী। আর যদি এইরূপ ধারণা করা হয় যে, সেই ক্রীড়াকুশলী উহার মধ্যে কথা বলার শক্তিও সৃষ্টি করিয়া দেয়, তখন লোকেরা বলিবে যে, সে তো কথাও বলে। এমতাবস্থায়, উহার তুলনা সামেরীর তৈরী সেই বাছুরের সংগে করা যায়, যাহার মধ্য কথা বলার সিফাত না থাকা সত্ত্বেও, উহার মধ্য ইহতে আওয়াজ নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাহারা একটি বস্তুকে দুইটি দেখার আপদ হইতে পবিত্র, তাহারা দেখিবে যে, এই মূর্তিটি একটি নিস্প্রাণ জড় পদার্থ বৈ আর কিছুই নয়। আসলে তাহার মধ্যে কোন সিফাতই অবশিষ্ট নাই, বরং উহার নির্মাতা, তন্মধ্যে সর্বপ্রকার হরকতের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও হরকতকে ঐ মূর্তির সহিত সম্পর্কিত করা হয় এবং উহার প্রস্তুতকারীর দিকে সম্পর্কিত করা হয় না। আর এমতাবস্থায় বলা হয় যে, মূর্তিটি হরকত করিতেছে। বস্তুতঃ এইরূপ বলা হয় না যে, প্রস্তুতকারী হরকত করিতেছে। বরং এইরূপ বলা হয়, বানানেওয়ালা তো হকরতের সৃষ্টিকারী, কিন্তু আসল হরকত তো মূর্তিই করিতেছে।

অতঃপর এইরূপ বলার আর কোন অবকাশই থাকে না যে, (আল্লাহ্তায়ালাই) সুখানুভব করেন এবং তিনিই কষ্টানুভব করেন। (আল্লাহ্ পানাহ!) যেরূপ কোন কোন সূফীদের অভিমত। আর তাঁহারা সুখ ও কষ্টানুভবকে আল্লাহ্তায়ালর সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন। এইরূপ অভিমত আদৌ সত্য নয়। কেননা, হক্ তায়ালা তো সুখ ও কষ্টের সৃষ্টিকারী, তিনি নিজেই সুখ ও কষ্টানুভবকারী নন। কাজেই, জানা গেল যে, যখন সিফাতের হাকীকত মাখলুকাত হইতে রহিত হইল, তখন যাতেরও হাকীকত উহা হইতে তিরোহিত হইল। কেননা, যাত তো ঐ সত্তাকে বলা হয়, যিনি নিজে নিজেই অস্তিত্ববান এবং সিফাত ঐ যাতের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর যাতই হইল ঐ সিফাতের ক্রিয়ার মূল উৎস।

বস্তুতঃ উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়ান হইল যে, সিফাত ও যাতের পরস্পর মিলন ব্যতীতও ঐ সিফাতের প্রতিক্রিয়ার স্রষ্টা হইলেন হক তায়ালা শানুহু। কাজেই, যাতের অবস্থা ইহার অধিক নয় যে, তিনিই কেবল মাত্র উহার স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকারী। এমতাবস্থায়, যাতের হাকীকতও উহা হইতে তিরোহিত হইল।

হাদিসে উল্লেখ আছে— 'ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা সূরাতিহি' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় সূরতের উপর আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন)। এই বর্ণনায় উহার ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা আদম আ. কে স্বীয় যাত ও সূরতের উপর পয়দা করিয়াছেন। কাজেই, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইল যে, আল্লাহ্তায়ালার যাতের এবং সিফাতের অনুরূপ কিছুই নাই। এই জন্যই হক তায়ালার বাণী- ওয়া হুয়াসসামীউল বাসীর অর্থাৎ তিনি সব কিছুই শ্রবণ করেন এবং দেখেন— এই উক্তিটি তাঁহার পবিত্রতা প্রকাশেরই পরিপূরক এবং সাদৃশ্যতাকে দূরীভূতকারী। ইহার অর্থ এইরূপ নয় যে, শ্রবণ ও দর্শন শক্তি মাখলুকাতের জন্য নির্ধারিত. আল্লাহতায়ালাও ঐ একই ধরনের শ্রবণ ও দর্শন শক্তির অধিকারী। বরং ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, মাখলুকাতের না শ্রবণ শক্তি আছে, না দর্শন শক্তি। বরং তাহাদের শ্রবণ করা এবং দেখা এই জন্যই যে, হক্ তায়ালা নিজে তাহাদিগকে কোন মাধ্যম ব্যতীতই এই শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এখানে আল্লাহ্তায়ালা শ্রবণ ও দর্শন শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সিফাতের অবস্থা এইরূপ। ইহার কারণ এই যে, এই দুইটি সিফাতের রহিতকরণে, যাহার প্রকাশ সর্বাধিক এবং মাখলুকাতের মধ্যে ইহা সকল সময়ই পরিদৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় বাকী সিফাতগুলি আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। ইহার ফলে জানা গেল যে, না আল্লাহ্র যাতকে জানা যায় এবং না তাহার সিফাতকে। মানুষ যেভাবে তাঁহার যাতের পরিচয় লাভে অক্ষম, একইরূপে তাঁহার সিফাতের মারেফাত লাভেও অক্ষম। মাটির সহিত মহান আল্লাহর সম্পর্ক কি? যেমন ফার্সী ভাষায় উক্ত আছে; চে নিস্বত খাক্রা বা আলমে পাক।



<u>**বেলায়েতে খাসসাহে মুহাম্মাদীয়া সম্পর্কেঃ**</u> জানা দরকার যে, খাস বেলায়েতে মুহাম্মাদীয়া (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মাজযুব সালিকদের জন্য নির্ধারিত; যাহাদের অপর নাম হইল "মুরাদীন"। আর "মুরিদীনদের"- উহাদের স্বভাবগত শক্তি অনুপাতে ঐ বেলায়েত হইতে কোন হিস্সা হাসিল হয় না। "মুরিদীন" শব্দ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত হজরত, যাহাদের সুলুক, উহাদের জযবার পূর্বে অবস্থিত। অবশ্য যদি কোন সুবাদে মাহবুব মুর্শিদ স্বীয় কোন প্রিয় মুরিদকে বিশেষভাবে তরবীয়তের দ্বারা; তাহাকে এমন কোন পূর্ণ জযবা প্রদান করেন যাহা নিজের আকর্ষণ শক্তির অনুরূপ, তবে সেটা আলাদা ব্যাপার। যেমন ছিল আমিরুল মুমেনীন হজরত আলী ইবন আবু তালেব রা. এর ব্যাপার। কেননা, তিনি অবশ্যই ছিলেন সালিকে মাজযুব। কিন্তু তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিশেষ তরবীয়তের ফলে, জযবার ফয়েজপ্রাপ্ত হন এবং বেলায়েতে খাসসার মরতবায় উপনীত হন। অবশিষ্ট তিনজন খলীফায়ে রাসূলের স. অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। তাঁহারা ছিলেন হজরত আলীর রা. পূর্বসূরী এবং তাঁহাদের জযবা তাঁহাদের সুলুকের আগে ছিল। আর এই অবস্থা ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেরও। কেননা, তাঁহারও স. জযবা ছিল; তাঁহার স. সুলূকের আগে। আর এই আলোচনার ফলে এইরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, প্রত্যেক মাজযুব সালিক এই বেলায়েতে খাসসা পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম।

এইরূপ কখন-ই নয়। বরং যদি হাজার হাজার মজযুব সালিকদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি, কয়েক শতাব্দী পরেও এইরূপ হইতে পারেন, তবে ইহাকে গনিমত মনে করা দরকার। আর ইহা তো আল্লাহর ফযল এবং নিয়ামত, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহতো বড়ই অনুগ্রহকারী। হক তায়ালা আমাদের সরদার মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার পরিবার পরিজনদের উপর শান্তি ও রহমত নাযিল করুন। আমীন।



সালিক-মাজযুব এবং মাজযুব-সালিকের মর্তবার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কেঃ মারেফাতের দৃষ্টিতে সালিক মাজযুবের তুলনায় মাজযুব সালিকের শ্রেষ্ঠত্ব অধিক। অবশ্য মহব্বতের ব্যাপার হইল ইহার বিপরীত। কেননা, হক তায়ালা সুবহানুহু প্রথম হইতে শেষাবস্থা পর্যন্ত মাজযুব-সালিকের তারবীয়াত স্বীয় খাস-মহব্বতের দ্বারা সম্পন্ন করেন এবং পূর্ণ অনুগ্রহের দ্বারা নিজের পবিত্র দরবারের দিকে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নেন।

এখানে মারেফাতের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ঐ মারেফাত, যাহা তাজাল্লিয়াতে আফআলীয়া অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর পরিচয় লাভ এবং আল্লাহ্তায়ালার সিফাতে-ইযাফীয়ার (অতিরিক্ত গুণাবলীর) সহিত সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ঐ মারেফাত, যাহার সম্পর্ক হইল আল্লাহ্তায়ালার যাতের সহিত, যাহাকে অজ্ঞতার সহিত ব্যাখ্যা করা হয়- একইরূপে ঐ মারেফাত, যাহার সম্পর্কে হইল– সিফাতে সালবীয়া-ই তানযীহার সহিত যাহা হয়রানী ও পেরেশানীর সমন্বয় মাত্র। একইভাবে ঐ মারেফাত, যাহার সম্পর্ক হইল-সিফাতে যাতীয়া-ই মওজুদার সহিত এবং ঐ মারেফাত যাহার সম্পর্ক হইল শুযুনে যাতিয়া-ই ইতিবারিয়ার সহিত। বস্তুতঃ যাহারা মাজযুবে-সালিক, তাঁহারা এই চার শ্রেণীর মারেফাতের অধিক হকদার এবং তাঁহাদের জন্যই ইহার ব্যাখ্যার অধিক প্রয়োজন।

এখন অবশিষ্ট রহিল ঐ সমস্ত মারেফাত, যাহার সম্পর্ক হইল দশটি মাকামের সহিত। যেমনঃ যুহদ, তাওয়াককুল, সবর এবং রেযা ইত্যাদি। বস্তুত যাঁহারা সালিক তাঁহারা এই সমস্ত মারেফাত এবং উহার ব্যাখ্যা লাভের অধিক হকদার। কেননা, তাঁহারা এই সমস্ত মাকামগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে জ্ঞান লাভের পর স্তরে স্তরে অতি দ্রুত উপরের দিকে উঠিয়া থাকেন। তাঁহারাই এই সমস্ত মাকামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হইতে পারেন, যাহা মাজযুব সালিকগণ জানিতে পারেন না। কেননা তাঁহাদের ব্যাপারে এই সমস্ত মাকামগুলিকে একত্রিত

করিয়া দেওয়া হয় এবং ইহার ফলশ্রুতিতে তাঁহারা প্রত্যেক মাকামের সার ও নির্যাস লাভ করিয়া থাকেন; যাহা সালিক মাজযুবের হাসিল হয় না। বস্তুতঃ সালিক-মাজযুবগণ এই মাকামগুলির জ্ঞান, বাহ্যতঃ অধিক লাভে সক্ষম হন এবং মাজযুব সালিকগণ ইহার সার ও নির্যাস লাভের কারণে অধিক পূর্ণতার অধিকারী হন।

এই জন্য সাধারণ ব্যক্তিরা, যাঁহারা কেবলমাত্র বাহ্যিক সুরতের দিকে লক্ষ্য করেন; তাঁহারা এইরূপ মনে করেন যে, যুহদ, তাওয়াককুল, সবর এবং রিযা ইত্যাদিতে সালিক-মাজযুবগণ, মাজযুব-সালিক হইতে অধিক পূর্ণ। কিন্তু তাঁহারা এতদসম্পর্কে অবহিত নন যে, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ মাজযুব সালিকগণ, যাঁহাদের মধ্যে রগবত পরিদৃষ্ট হয় উহা তাঁহাদের জন্য যুহদের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে অন্তরায় নয়। একইভাবে আসবাবের (সরঞ্জামাদির) সম্পর্ক, পূর্ণ তাওয়াককুলের জন্য অন্তরায় নয়। আর তাঁহাদের মধ্যে অপছন্দনীয় অবস্থা দৃষ্ট হওয়া, রিযারও অন্তরায় নয়। কেননা, তাঁহাদের এই রগবত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হইয়া থাকে। তাঁহাদের আসবাবের সহিত সম্পর্ক, আল্লাহ্ সুবহানুহুর জন্যই হয়। একইরূপে তাঁহাদের মধ্যে নাপছন্দী অবস্থা প্রকাশিত হওয়াও একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে এই সমস্ত গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানুহুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। তাঁহারা যখন দুনিয়াকে ভালবাসেন, তখন এই ভালবাসার মূলে থাকে আল্লাহ্ সুবহানুহুর সন্তুষ্টি অর্জন মাত্র; অন্য কোনকিছু নয়। আর তাঁহারা যদি স্বীয় নফসের জন্য কোনকিছুকে পছন্দ করেন, তবে যেহেতু তাহাদের নফস পরোয়ারদিগারের ফরমাবরদার হইয়াছে; এইহেতু তাঁহাদের ঐ পছন্দ প্রকৃতপক্ষে স্বীয় পরোয়ারদিগার আযযা জাল্লার জন্যই হয়।



মারেফত চব্বিশ

<u>সূরতে ঈমান এবং হাকীকতে ঈমান সম্পর্কেঃ</u> ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই যিকিরের উদ্দেশ্য হইল, বাতিল মাবুদসমূহকে অস্বীকার করা। চাই উহা আফাকী (বহিঃর্জগতের) হউক, কিংবা আনফুসী (মনোজগতের)। আফাকী মাবুদসমূহের

অর্থ হইল, কাফির ও ফাজিরদের বাতিল উপাস্য; যেমন-লাত, উজ্জা ইত্যাদি আর আনফুসী মাবুদসমূহের অর্থ হইল- খাহেশাতে নাফসানী। যেমন, এতদসম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইরশাদ- 'আপনি কি তাহাদের দেখিয়াছেন, যাহারা স্বীয় খায়েশাতকে-ই তাহাদের উপাস্য বানাইয়াছে?' ঈমান অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস, যাহা আমাদিগকে শরীয়তের উপর পরিচালনার মূল উৎস; উহাই বাতিল আফাকী মাবুদসমূহের অস্বীকার করাইবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আনফুসী বাতিল উপাস্যদের অস্বীকারের জন্য নাফসে-আম্মারাকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রয়োজন আছে। আর যাহারা আহলুল্লাহদের রাস্তায় (সুলুকে) চলেন, তাঁহারা ইহা হাসিল করিতে পারেন। ঈমানে হাকিকী হইল- এই দুই ধরনের বাতিল মাবুদের অস্বীকারের সহিত সম্পৃক্ত। কিন্তু ঈমান সম্পর্কে জাহিরী শরীয়তের হুকুম, কেবলমাত্র আফাকী মাবুদসমূহের অস্বীকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই ধরনের ঈমান, কেবলমাত্র ঈমানের সুরত-ই হয় এবং ঈমানের হাকীকত তো আনফুসী মাবুদদের অস্বীকারের উপরই নির্ভরশীল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সূরতী ঈমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু হাকিকতে ঈমান এইরূপ সম্ভাবনা হইতে সুরক্ষিত। কেননা, সূরতে ঈমানে প্রথম তো নাফসে আম্মারাই স্বীয় অস্বীকার ও কুফরি হইতে বিরত থাকে না। সূরতে ইমানে ইহা হইতে অধিক কিছু লাভ হয় না যে, উহা নফসে আম্মারার বিরোধিতা ছাড়া কলবের মধ্যে সামান্য বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। কিন্তু ঈমানে হাকীকিতে, নাফসে আম্মারা স্বয়ং, যাহা স্বভাবগত ভাবে বিদ্রোহী, উহা অনুগত হইয়া বিরোধিতা হইতে ফিরিয়া আসে এবং ঈমানের আলোকে আলোকিত হয়। শরীয়তের নির্দেশসমূহের মূল উদ্দেশ্য হইল- নাফসকে বশীভূত করা। কেননা, কলব তো সৃষ্টিগতভাবেই, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অনুগত ও বশীভূত হইয়া থাকে। যদি কলবের মধ্যে কোন ধরনের খারাবীর সৃষ্টি হয়, উহা নাফসের সংসর্গের কারণেই হইয়া থাকে। যেমন কোন কবির ভাষায়ঃ

তাওয়াযু যে গরদান ফারাযা নাকুস্ত,
গাদাগর তাওয়াযু কুনদ খুয়ে উস্ত!

উন্নত শির উত্তম যদি বিনয়ের সাথে হয়,
মাজবুর মুসাফির অভ্যাস বশে বিনয়ে বাধ্য হয়।

বস্তুতঃ হাকীকতে ঈমান হাসিলের জন্য, নাফসের পরিশুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন এবং উহার ফলশ্রুতিতে উহা ধ্বংস হইতে সুরক্ষিত থাকে। আর তাযকীয়ায়ে নাফসের সম্পর্ক হইল– দর্জায়ে বেলায়েতের সহিত এবং ইহার অর্থ হইল, ফানা ও বাকা লাভ। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি বেলায়েতের দর্জায় পৌঁছায়, ততক্ষণ তাহার

ইতমিনানে নাফস (প্রশান্ত প্রবৃত্তি) হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। আর যতক্ষণ না নাফস ইতমিনানের সহিত সম্পৃক্ত হয়, ততক্ষণ হাকীকতে ঈমানের ঘ্রাণ লাভ হয় না এবং উহা ধ্বংসের সম্ভাবনা হইতে নিরাপদ হয় না। যেমন, আল কুরআনের ভাষায়- আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খওফুন আলায়হিম ওয়ালাহুম ইয়াহযানূন অর্থাৎ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহর ওলী, তাহাদের না আছে কোন ভয় এবং না আছে কোন চিন্তা (১০ঃ৬২)। তাই কোন কবি বলেন-

আয্ ইয়ে-ই আয়েশ্ ও উশ্রাত্ সাখ্তান্,
সাদ্ হাযারা জা ববাযেদ্ বাখ্তান।

সম্ভোগ তরে এই দুনিয়ার আয়েশ আরাম,
হাজার হাজার জীবনের দাবী হয় যে হারাম।



তরীকত এবং হাকীকতের সহিত শরীয়তের সম্পর্কঃ শরীয়ত, তরীকত এবং হাকীকত। হাকীকতের অর্থ হইল– শরীয়তের হাকীকত। এইরূপ নয় যে, হাকীকত শরীয়ত হইতে আলাদা কোন জিনিস। আর তরীকতের অর্থ হইল– হাকীকতে শরীয়ত পর্যন্ত পৌঁছানোর পদ্ধতি বা পথ। ইহা শরীয়ত এবং হাকীকত হইতে আলাদা কোন বস্তু নয়। শরীয়তের হাকীকত বিশুদ্ধভাবে হাসিল হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র শরীয়তের সূরত হাসিল হয় এবং শরীয়তের হাকীকত লাভ, নাফসের প্রশান্তির মাকামে হইয়া থাকে। যখন কোন লোক বেলায়েতের দর্জায় পৌঁছায়, তখন বেলায়েতের মরতবায় পৌঁছানো এবং নাফসের প্রশান্তি লাভের পূর্বে; তাহার কেবলমাত্র শরীয়তের বাহ্যিকরূপ হাসিল হয়। যেমন ঈমানের প্রসংগ আলোচনাকালে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, নাফসের ইতমিনান হাসিলের পূর্বে কেবলমাত্র ঈমানের সূরত লাভ হইয়া থাকে এবং ইতমিনান হাসিলের পর ঈমানের হাকীকত লাভ হয়।

<u>ফানার স্তর সম্পর্কেঃ</u> ফানার অর্থ হইল- হক তায়ালা জাল্লাশানুহুর হাস্তি দর্শনের প্রাবল্যের কারণে, হক তায়ালা ব্যতীত আর সব কিছুকে ভুলিয়া যাওয়া। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, মানুষের রূহ, সির, খফী, আখ্‌ফা, নফ্‌স ইত্যাদি শরীরের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার পূর্বে, স্বীয় হাকীকী স্রষ্টার এক ধরনের জ্ঞান রাখিত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র যাতের সহিত উহাদের এক প্রকারের সম্পর্ক ছিল। বস্তুতঃ উহার মধ্যে উন্নতি করিবার মত শক্তি নিহিত ছিল এবং উহা প্রকাশের জন্য জড় দেহের সহিত উহার সম্পর্কিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। এই জন্য প্রথমে উহাকে ইশ্‌ক ও মহব্বতের গুণে বিভূষিত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে (রূহ এবং শরীরের) মধ্যে মহব্বতের সম্পর্ক পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়। বস্তুতঃ রূহ এই সম্পর্কের কারণ স্বীয় পূর্ণ সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও নিজেকে এই তমসাচ্ছন্ন শরীরের মধ্যে বিলাইয়া দেয় এবং স্বীয় অস্তিত্বকে উহার অনুসারী সির, খফী ও আখফার সহিত এই শরীরের মধ্যে ফানা করিয়া দেয়। আর এ কারণেই বহু জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে কেবল মাত্র দেহধারী ব্যতীত আর কিছুই মনে করে না এবং তাহারা দেহ ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব কে স্বীকারও করে না।

<u>ফানায়ে জিসমীঃ</u> আর আল্লাহ্‌তায়ালা, যিনি আরহামুর রাহিমীন, স্বীয় পরিপূর্ণ রহমতের দ্বারা, আম্বীয়া আলায়হিমুস্‌ সালামদের (যাঁহারা সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ) যবানীতে, লোকদিগকে স্বীয় পবিত্র সত্তার দিকে আহবান করিয়াছেন এবং এই অন্ধকারাছন্ন অবস্থার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালার ইরশাদ- কুলিল্লাহ, ছুম্মা যাবহুম। অর্থাৎ ‘হে নবী! আপনি বলুন, (মুসা আঃ এর উপর) আল্লাহ্ কিতাব নাযিল করেন। অতঃপর তাদের ছাড়িয়া দিন।’ বস্তুতঃ যাহার অনন্ত সৌভাগ্য হাসিল হইয়াছে, সে নশ্বরজগত হইতে মুখ ফিরাইয়া ঊর্ধ্ব জগতের দিকে মুতাওয়াজাহ্ হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে পুরাতন মহব্বত বৃদ্ধি করিয়া নতুন সৃষ্ট বন্ধুত্বকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এমনকি ঐ জড়দেহের প্রতি আকর্ষণ পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে এবং উহার প্রতি মহব্বতের কোন নিদর্শনই আর বাকী নাই। এমতাবস্থায় ফানায়ে জাসাদী বা দৈহিক ফানা হাসিল হয়। আর তরীকতের রাস্তায় যাহাদের দুই কদম চলার যোগ্যতা হাসিল হইয়াছে, তাহারা অভিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। যেমন কথিত আছে- খুত্‌ওয়াতানে, ওয়া কাদ অসালতা অর্থাৎ দুইটি কদম মাত্র, আর তুমি পৌঁছিয়া গিয়াছ! এই দুইটি কদম হইতে সে একটি কদমকে (ফানায়ে জিসমী হাসিলের পর), অভিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইল।

<u>ফানায়ে রূহীঃ</u> অতঃপর যদি কেবলমাত্র আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর ফযলে, এই মাকাম হইতে উন্নতি লাভ হয়, তখন মানুষ রূহের অস্তিত্ব এবং উহার অস্তিত্বের অনুসারীদের ভুলিতে চেষ্টা করে। আর ক্রমশঃ এই বিস্মৃতির পর্যায় বৃদ্ধি পাইতে

থাকে, যাহার ফলে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে একেবারেই ভুলিয়া য়ায়। এমতাবস্থায়, ওয়াজিবুল অজুদ জাল্লা শানুহুর দর্শন ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই ধরনের ফানাকে ফানায়ে-রূহী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, যাহা পূর্বোক্ত দুই কদমের দ্বিতীয় কদম। আর রূহের এই অধঃজগতের দিকে অবতরণের উদ্দেশ্য হইল, এই দ্বিতীয় ধরনের ফানা হাসিল করা এবং ইহা ব্যতীত এই সম্পদ লাভ হয় না।

একটি সূক্ষ্ম গোপন তত্ত্বঃ আর ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম গোপন তত্ত্ব নিহিত আছে, উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত আহলুল্লাহদের নিকট গোপন নয় এবং সেই গোপন তত্ত্বটি এই যে, রূহের জন্য নিজের অস্তিত্বকে ভোলার পর্যায়ে, অন্য কোনকিছুর সহিত উহার গভীর মহব্বত থাকা জরুরী। আর মহব্বত যেমন উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে হইয়া থাকে, ঐরূপ অনুপস্থিত বস্তু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় না। কাজেই রূহ্ প্রথমে উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর পূর্ণ মহব্বত হাসিল করে, যাহা উহার সত্তাকে ফানাকারী ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজেকে ফানা করার জন্য অদৃশ্যে ঐ মহব্বতের সাহায্য নেয়। ইহাই ঐ সূক্ষ্ম গোপন তত্ত্ব, যাহা বিজ্ঞ আরিফগণ ব্যতীত অন্যেরা জানে না।

ফানায়ে কলবীঃ কলবকে মূলতত্ত্বের সমন্বয়কারীরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এমতাবস্থায় উহা রূহের অনুসারী হয়। কাজেই যখন উহা উন্নতি করিয়া স্বীয় মাকাম হইতে রূহের মাকামে পৌঁছায়, তখন রূহের অনুসরণের কারণে উহারও বিস্মৃতির স্বভাব হাসিল হয় এবং উহার ফানার সহিত নিজেও ফানা হয়।

ফানায়ে নাফসীঃ এখন অবশিষ্ট রহিল নাফ্স। নাফ্সের পবিত্রতা কলবের মাকামে পৌঁছানোর পর হইয়া থাকে। আর ইহা তখনই হাসিল হয়, যখন কলব নিজেই উন্নতি করিয়া রূহের মাকামে পৌঁছায়। 'আত্তারিফ' গ্রন্থের প্রণেতা শায়েখুশ শুয়ূখ[১] পূর্বোক্ত বিস্মৃতিকে নাফসের মজ্জাগত হিসাবে স্বীকার করেন না। বরং তিনি নাফসের পূর্ণ পবিত্রতা উহার মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করেন যে, নাফস কলবের মাকামে পৌঁছানোর যোগ্যতা অর্জন করিবে। কিন্তু আমি নগণ্যের অভিমত এই যে, উক্ত বিস্মৃতি নাফসের মজ্জাগত হইয়া থাকে। কিন্তু নফসের এই অবস্থা, কলবের মাকাম হইতে উন্নতি করিয়া রূহের মাকামে পৌঁছানোর পর হাসিল হইয়া থাকে। কাজেই, নাফসেরও যে ফানা হইয়া থাকে, ইহা প্রমাণিত হইল; যেমন কলবের ফানা হইয়া থাকে। আর এই নাফসই প্রশান্ত হওয়ার পর পরোয়ারদিগারের দিকে

---

১. হজরত শায়েখ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী র. সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার প্রণেতা। তিনি স্বীয় চাচা আবুল খায়ের সোহরাওয়ার্দী র. এর মুরীদ এবং খলিফা ছিলেন। আর তাঁহারই খলিফা ছিলেন বাহাউদ্দিন মুলতানী র.। তাঁহার প্রণীত "আত্তারিফুল মাওয়ারিফ" গ্রন্থটি তাসাউফের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি ৬৩২ হিজরীতে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।

প্রত্যাবর্তিত হয় এবং কলবের মাকাম হইতে, আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া যায়। হকসুবহানুহ তায়ালা এই শানে ইরশাদ করিয়াছেন ‘ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাতু, ইরজিয়ী ইলা রব্বিকা রদ্বীয়াতাম মারদ্বীয়্যাহ্’ অর্থাৎ হে নাফসে মুতমাইন্না (এখন তুমি) তোমার রবের দিকে সন্তুষ্ট ও প্রসন্নচিত্তে প্রত্যাবর্তন কর (৮৯ঃ২৭,২৮)। অবশ্য যতক্ষণ উহা কলবের মাকামে অবস্থান করে, যে সম্পর্কে শায়েখুশ শুয়ুখ বর্ণনা করেয়াছেন এবং যাহাকে তিনি নাফসে মুতমাইন্না হিসাবে নামকরণ করিয়াছেন; ঐ সময় পর্যন্ত, উহার জন্য উক্ত বিস্মৃতি অনুপস্থিত থাকে। বরং এই মাকামে অবস্থানকালে, উহার জন্য ইতমিনান নামটিও শোভনীয় নয়। উহার পরিশুদ্ধি ঘটে বটে, কিন্তু তখনও উহার ইতমিনানের সহিত কোনরূপ সম্পৃক্ততা হাসিল হয় না। কেননা, কলবের মাকাম হইল পরিবর্তনশীল এবং ইতমিনান হইল উহার বিপরীত বস্তু। কাজেই, প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান এই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেনা; বরং ইহাতো আল্লাহ তায়ালার ফযল, তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল।

মু’আমিলায়ে কালেবঃ এখন অবশিষ্ট রহিল ঐ অবস্থা যাহা দেহের সহিত সম্পর্কিত। বস্তুতঃ শারীরিক অংগ প্রত্যংগের আমল ব্যতীত যাহা মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়তে বর্ণিত হইয়াছে, সবকিছুই বেলায়েতের বৃত্তের বাহিরে এবং জযবা ও সুলুক- উভয় তরীকারই বাহিরের বস্তু। কেননা, ইহার অবস্থা, কলবের পরিছন্নতা এবং তাযকীয়ায়ে নাফস ব্যতীত অন্যদেরকে এই মাকামের পরিচিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই। আর এইজন্য কেহই এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে কিছুই আলোচনা করেন নাই। বস্তুতঃ কুরআন পাক এবং নবী করীম সলাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসে যদিও এতদসম্পর্কে উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা কেবলমাত্র ইশারা ও গোপন তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, এই দুর্বল ব্যক্তিও এই সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করিবে না। আর পরিচিতি বেলায়েতের পর্যায়েই (যাহা ফানার অবস্থা) ইহার বর্ণনা সংক্ষেপ করিতেছি। বস্তুতঃ ইহার পরে যদি জানা যায় যে, শ্রোতাদের মধ্যে এই কথাটি বুঝিবার মত যোগ্যতা হাসিল হইয়াছে, তখন এতদসম্পর্কে আমার জ্ঞাত বিষয় শ্রোতাদের বোধশক্তির অনুরূপে বর্ণনা করিব ইনশাআল্লাহ। আর হক সুবহানুহু তায়ালাই তওফীক প্রদানকারী এবং সত্য কথাকে হৃদয়ে নিক্ষেপকারী।

হুঁশিয়ারীঃ ইহা জরুরী নয় যে, যাহার রূহের ফানা লাভ হইয়াছে, তাহার কলবের ফানাও নসীব হইবে! অবশ্য ইহা জরুরী যে, কলবের- রূহের প্রতি, যাহা

উহার জন্য পিতা সদৃশ, এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং নাফসের প্রতি, যাহা কলবের-মা সদৃশ, এক ধরনের বিকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যদি উহার (কলবের) এই আকর্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উহাকে পরিপূর্ণরূপে পিতার (রূহের) প্রতি আকর্ষিত করে আর উহাকে রূহের মাকামে পৌঁছাইয়া দেয়; এমতাবস্থায় উহা পিতার গুণে, অর্থাৎ ফানার গুণে গুণান্বিত হয়। নাফসের অবস্থা এইরূপ যে, রূহ ও কলবের ফানার কারণে, উহার ফানা অবশ্যম্ভাবী নয়। সংক্ষেপে ব্যাপার এই যে, নাফসেরও স্বীয় পুত্র অর্থাৎ কলবের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আর যদি এই আকর্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে উহাকে পুত্রের মর্তবায় পৌঁছাইয়া দেয়। সে স্বীয় নেককার পিতার মাকামে উপনীত হয়। এমতাবস্থায় নাফস পুত্রের গুণে গুণান্বিত হয়, যে উহার পিতার চরিত্রে চরিত্রায়িত হইয়াছে; এবং ফানা হাসিল করে।

ফানায়ে সির, খফী ও আখফাঃ বস্তুতঃ এই তিনটি স্তর, যাহার অবস্থান রূহের উপরে, উহাদের অবস্থাও এইরূপ ফানা হওয়া সত্ত্বেও উহাদের ফানা অবশ্যম্ভাবী নয়। অবশ্য রূহের নিম্নে অবতরণের সময়, এই তিনটি স্তরও পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে, রূহের আনুগত্যের ফলে অবতরণ করে এবং রূহের মহব্বতর আধিক্য উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায়, উহারা স্বীয় যাত (অবস্থা) সম্পর্কে এরূপ বিস্মৃত হয় যে, প্রত্যাবর্তনের সময় এই তিনটিরও পূর্ণ অথবা আংশিক ফানা হাসিল হয় এবং রূহের মত উহারাও ফানা হইয়া যায়।

ফানায়ে কলবের নিদর্শনঃ প্রকাশ থাকে যে, ভয় ভীতি কলব হইতে বিলকুল উঠিয়া যাওয়া, প্রকারান্তরে হক সুবহানুহুকেই ভুলিয়া যাওয়ার আলামত। কেননা খাত্বায়ে কলবের অর্থ, দিলের মধ্যে কোন বস্তু হাসিল হওয়া এবং উহার খেয়াল দিলের মধ্যে থাকা; চাই উহা আপনাআপনিই খেয়ালে আসুক বা স্মরণ করার ফলে আসুক। আর কোন জিনিসের খেয়াল দিলের মধ্যে আসা এবং খেয়াল দিলের মধ্যে থাকাই হইল ইল্ম। কোন বস্তুর খেয়াল যখন দিলের মধ্যে আসা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যদি স্বাভাবিকভাবে উহাকে আনার চেষ্টা করা হয়, তবুও আসে না এবং উহার কথা যদি স্মরণও করে; তবুও স্মরণে আসে না। এমন অবস্থায়, উহার অর্থ এই যে, উহার ইলম একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে। আর জ্ঞানের এইরূপ বিনষ্টি হইল বিস্মৃতি, যাহা ফানার স্তরের অবস্থা।

ইহাই হইল ফানার বিবরণের শেষ বর্ণনা। মাশায়েখদের কেহই, এইরূপ ব্যাখ্যার সহিত, এই মাকাম সম্পর্কে আলোচনা করেন নাই এবং হক সুবহানুহু

তায়ালা ব্যতীত অন্য সবকিছুকে ভুলিয়া যাওয়া হইতে অতিরিক্ত কোন ফানার অর্থ তাঁহারা বলেন নাই। আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আরো অনেক কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। যদি আল্লাহ্তায়ালা তওফীক দেন, তবে এই ফকীর ইহা হইতেও অধিক বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করিবে। কেননা, এই মাকামটি তালেবগণের ভ্রমে আপতিতকারী মাকাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়ালাই অধিক অভিজ্ঞ।



মারেফত ছাব্বিশ

আল্লাহ্ তায়ালার সাথে রূহের সাদৃশ্যঃ কখনও এইরূপ হয় যে, সালেকের দৃষ্টি আলমে আরওয়াহ্ এর উপর পড়ে। আর ইহার কারণ এই যে, আলমে আরওয়াহ্ এর মরতবায়ে ওজুবের (অবশ্যম্ভাবী স্তর) সহিত সম্পর্ক। যদিও এই সম্পর্ক কেবলমাত্র সুরতের দৃষ্টিতে হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সালেক এই জগতকেই হক মনে করে এবং এই আলমের দর্শনকে হক সুবহানুহু তায়ালার মুশাহিদা হিসাবে ধারণা করে এবং উহা দ্বারা আনন্দ অনুভব করে। বস্তুতঃ আলমে আরওয়াহ্ এর সহিত আলমে আজসাদের (জড় জগতের) এক ধরনের সম্পর্ক আছে। কাজেই, ঐ জগতের দর্শনীয় বস্তুকে জগতের আধিক্যের মধ্যে, একের দর্শন হিসাবে মনে করে এবং উহার মধ্যে যাতের বেষ্টন ও যাতের সংগতার ধারণা করে। আর এইরূপ ধারণার ফলশ্রুতিতে সালেকের মূল উদ্দেশ্য পর্যন্ত উন্নতি করিবার বা পৌঁছিবার রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। যদি এই স্তর হইতে তাহাকে অগ্রগামী করা না হয়, আর সে যদি বাতিল হইতে হকে না পৌঁছাইতে পারে, তবে তাহার জন্য আফ্সোস্! শতবার আফসোস। কোন কোন মাশায়েখ এই মাকামে ত্রিশ বৎসর যাবৎ রূহকে আল্লাহ্ মনে করিয়া, উহার ইবাদত করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্র অনুগ্রহে যখন তাহারা ঐ স্তর অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তাহারা উহার খারাবী সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছেন। ঐ আল্লাহ্র শোকর। তিনি যদি আমাকে এই পথের সন্ধান দান না করিতেন, তবে আমি ইহার সন্ধান পাইতাম না। ইহা অবিসম্বাদিত নিশ্চিত সত্য যে, আমাদের পরোয়ারদিগারের সমস্ত রাসুলগণ সত্য সহ-ই আগমন করিয়াছিলেন।



ওজুদে সিফাতকে (আল্লাহর গুণাবলীর অস্তিত্ব) কিছু লোকের অস্বীকারের কারণঃ

কোন কোন মাশায়েখ, যাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালা জাল্লা শানুহুর সিফাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা সিফাতকে বাহ্যিক জগতে, যাতের অনুরূপ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই সমস্ত হজরতগণ তাজাল্লীয়াতে সিফাতীয়ার স্তরে আবদ্ধ আছেন এবং সিফাত তাঁহাদের জন্য, যাতে জাল্লা শানুহুর দর্শনের আয়না স্বরূপ হইয়াছে। আর আয়নার অবস্থা এই যে, উহা দর্শনকারীর দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে, (অর্থাৎ উহাতে তাহাই দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা আয়নার বিপরীতে থাকে)। বস্তুতঃ সিফাত আবশ্যিকভাবে আয়না স্বরূপ হওয়ার ফলে, উহাদের দৃষ্টি হইতে উহা অদৃশ্য হইয়াছে, আর যেহেতু তাহাদের দৃষ্টিতে সিফাত আসে না, সেইজন্য তাহারা এইরূপ ফয়সালা দেন- বাহ্যিক জগতে উহা যাতের অনুরূপ। আর ইলমের স্তরে তাঁহারা পবিত্র যাতের সহিত সিফাতের পার্থক্যের যে কথা বলিয়াছেন; উহা এইজন্য যে, যাহার ফলে সিফাতের অস্তিত্ব অস্বীকার যেন পুরাপুরিভাবে অবশ্যম্ভাবী না হইয়া পড়ে।

আর যদি এই সমস্ত হজরতগণ এই স্থান হইতে ঊর্ধ্বগমনে সক্ষম হইতেন এবং তাঁহাদের এই দর্শন সিফাতের এই আয়নার বাহিরে লাভ হইত, তবে তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিতেন যে, আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাতের এই ফয়সালা সত্য, বাস্তবের অনুরূপ এবং নবুয়তের ফানুস হইতে সংগৃহীত। আর উহা এই যে, সিফাত আলাদাভাবে মওজুদ এবং উহা যাতের উপর অতিরিক্ত।



কুফরে শরীয়াত এবং কুফরে হাকীকত সম্পর্কেঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, যাহাকে স্বীয় অনুগ্রহে, উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করাইতে চান- তিনি তাঁহাকে সব মাকামে ফানা ও বাকা দান করেন। যতক্ষণ না তাহার নুযুলের (অবতরণের) মাকামে কিছু ফানা ও বাকা নসীব হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ মাকাম হইতে উপরের দিকে উরুজের (উর্ধ্বগমনের) কোন চিন্তাই তাহার জন্য করা যায় না। ইহাই আল্লাহ্তায়ালার বিধান, যাহা পূর্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আর তুমি আল্লাহ্র তরীকায় কোন সময় কোনরূপ পরিবর্তন পাইবে না। তাই কোন কবির ভাষায়ঃ

বাকুফরে ওয়াবা ইসলাম ইকসা নাগর
কে হারয়েক্ যে দেওয়ানে উ দফ্তরে আস্ত।

জানিবে নিশ্চিত করে কুফর ও ইসলামের,
হইল দফ্তর দুইটি, তার দেওয়ানের।

কুফর এবং ইসলামকে একই দৃষ্টিতে দেখা তখনই সম্ভব, যখন তাওহীদের আধিক্য এবং মত্ততার প্রাবল্য হয়, যাহা কেবলমাত্র একত্রিতকারী স্থানে হাসিল হয় এবং ইহা ফানা ও ধ্বংসের মাকাম। আর এখানে দেখা আবশ্যক যে, সালিকের ইচ্ছানুসারে যেন এইরূপ না হয়, এমতাবস্থায় সে অবশ্যই ক্ষমার্হ। যে সালিকের এই মাকাম পরিভ্রমণ নসীব হয় নাই, সে ফরক বাদাল জামআর (সম্মিলনের পর সম্পর্কচ্যুতি) মাকাম পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এইরূপ ব্যক্তি কখনই হাকীকী ইসলামের সুভাস লাভে সক্ষম হইবে না এবং সে সর্বক্ষণ হাকীকী কুফরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। আর সে কখনই হক তায়ালা সুবহানুহুর রেযামন্দীকে; তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইবে না। যেমন কোন কবি বলেন—

হার্ কাসকে কুশ্তাহ্ গাশত আযা খালে-হিন্দুশ্,
গারচেহ শাহীদ রাফ্ত মুসলমা-নমী রুদ।
যে তার কালো তিলের তরে, করিল আত্মদান,
হইয়াও শহীদ সে যে, রহিল না মুসলমান।

খালে হিন্দুশ (কালোতিল) অন্ধকার এবং আচ্ছন্নতার খবর দেয়, যাহা কুফরীর মাকামের অনুরূপ। ইহার সহিত মুসলমানীর কোন সম্পর্ক নাই। শরীয়তের দৃষ্টিতে, যেমন ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য না করা কুফরে শরীয়ত, একইরূপে হাকীকতের দৃষ্টিতেও এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করা কুফরে হাকীকত। বস্তুতঃ হালের আধিক্য প্রকাশের পূর্বে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য না করা, যেমন আহলে শরীয়তদের নিকট কুফরী, তদ্রূপ আহলে হাকীকতদের নিকটও কুফরী এবং নিন্দার যোগ্য। আহলে শরীয়ত ও আহলে হাকীকতদের মধ্যে, যদি কোনরূপ মতপার্থক্য থাকে তবে উহা হালের আধিক্যতার ফলশ্রুতি মাত্র। যেমন মানসুর হাল্লাজের[১] অবস্থা, যিনি মাগলুবুল হালে ছিলেন। আহলে শরীয়ত তাঁহার এই আচরণকে কুফরীর হুকুম দেন এবং আহলে হাকীকত বলেন, ইহা কুফরী নয়। তবুও আহলে হাকীকতের দৃষ্টিতে তিনি অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিসাবে খ্যাত এবং তাঁহারা তাঁহাকে কামেল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে মনে করেন না। যেমন তাঁহাকে প্রকৃত মুসলমান হিসাবেও মনে করেন না। যেমন, মানসুর হাল্লাজের নিজের কবিতাই এই সাক্ষ্য বহন করেঃ

কাফরতু বে-দীনিল্লাহে, ওয়াল্ কুফ্রু ওয়াজেবুন
লাদায়য়া, ওয়া ইনদাল্ মুসলেমীনা কাবীহুন্।
কাফির হয়েছি আমি দ্বীনে হক হতে,
যদিও ভয়ংকর ইহা মুসলিম মতে।

হুঁশিয়ারীঃ বস্তুতঃ হালের আধিক্য প্রকাশের আগে, হালের অধিকারীদের অনুসরণ করা এবং পার্থক্য না করা বেয়াদবী, কাফির ও মুশরিকের ন্যায় কাজ এবং কুফরে শরীয়ত ও হাকীকত। আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়ালা আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানদিগকে এইরূপ অনুসরণ হইতে মাহফুজ রাখুন। অনুসরণের শানই তো শরীয়তের ইলম। চিরস্থায়ী নাজাত, কেবল মাত্র ইমাম আবু হানীফা র. এবং ইমাম শাফী র. এর অনুসরণের মধ্যেই নিহীত আছে। হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র.[২] ও

---

১. হোসায়েন বিন্ মানসুর হাল্লাজের কুনিয়াত ছিল আবুল মুগীছ। তাঁহার জন্মভূমি ছিল পারস্য। তাঁহার 'আনাল হক' দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন আব্বাসীয় খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ, তাঁহাকে হিজরী ৩০৯ সনে, বাগদাদে কতল করেন।

২. হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. সাইয়্যেদুত তায়েফাহ্ উপাধিতে ভুষিত ছিলেন। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হজরত সারীউস সাকতী র. এর ভাতিজা এবং খলীফা ছিলেন। তিনি ২৯৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

শিবলী[১] র. এর কথাবার্তা দুইটি বিবেচনায় গ্রহণীয়। হাল প্রকাশের আগে, তাহাদের ঐ সমস্ত কথাবার্তা শ্রবণ করা, আল্লাহ অন্বেষণকারীদের জন্য ঐ হালের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী এবং এক ধরনের মত্ততা সৃষ্টিকারী স্বরূপ হয়। হাল প্রকাশের পর, তাহারা তাঁহাদের ঐ কথাবার্তাকে নিজের হালের অনুরূপ বানাইয়া লয়। এই দুইটি বিবেচনা ব্যতীত, ইহাদের কথাবার্তা সম্পর্কে জানা এবং উহা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা নিষিদ্ধ। কেননা, ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। বস্তুতঃ যেখানে সামান্যতম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, জ্ঞানী লোকেরা কখনই সেদিকে অগ্রসর হয় না। কাজেই যেখানে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে সেদিকে অগ্রসর হওয়া কি আদৌ উচিত?



মারেফত উনত্রিশ

<u>ইসমুল মুদিল্লির রাস্তায় কাফিরদের ওয়াসিল হওয়া সম্পর্কেঃ</u> কোন কোন তরীকতের মাশায়েখগণ, (কাদ্দাসাল্লাহ আসরারাহুম) মত্ততা ও হালের আধিক্যের মধ্যে বলিয়াছেন, কাফিরও মুমিনের মত মাকসুদে হাকীকীতে (মূল উদ্দেশ্যে) পৌঁছাইয়া যায়, তবে তাহার সেই পৌঁছানোর রাস্তা ভিন্ন। কেননা, কাফির আল্লাহ্তায়ালার নাম “আলমুদিল্লু” (পথভ্রষ্টকারী) এর রাস্তায় ওয়াসিল হয় এবং আহলে ইসলাম, আল্লাহ্ তায়ালার নাম “আলহাদী” (পথপ্রদর্শনকারী)-এর রাস্তায় আল্লাহর সহিত মিলিত হয়। তাহারা এই মাকামে, এমন তেমন অনেক কথাই বলিয়াছেন। অপরপক্ষে, অন্য কিছুলোক, যাহারা ইহাদের সহিত সম্পর্কিত, কেবল তাকলীদের অনুসারী হিসাবে এমন কিছু কথা বলিয়াছেন, যাহার ফলশ্রুতিতে কিছু সাধারণ লোক গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট হইয়াছে। আসলে ইহার হাকীকত হইল অন্য কিছু, যাহা প্রখ্যাত আহলুল্লাহদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। এতদসম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হইল।

---

১. হজরত শিবলী র. এর কুনিয়াত ছিল আবুবকর। তিনি ২৪৫ হিজরীতে বাগদাদে অথবা সামিরাতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ৩৩৪ সনে, ৮৮ বৎসর বয়সে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। শেষ জীবনে, তিনি মৃত্যু কখন আসে এই ধারণায়; সর্বক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পরিবর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলিতেন।

একটি সন্দেহ এবং উহার আপনোদনঃ জানা উচিত যে, সালিক যখন আল্লাহ্ প্রাপ্তির রাস্তায় পরিভ্রমণ শুরু করে, তখন এই রাস্তায় চলার সময় তাহার সম্মুখে, হক-সুবহানুহুর নৈকট্য ও সংগতা, বস্তুর সহিত পরিদৃষ্ট হয়। চাই সে বস্তু যে ধরনেরই হউক না কেন। এ্ই সময় সালিক, যাতে হক-সুবহানুহুকে, প্রত্যেক বস্তুর সাথে মওজুদ পায় এবং উহাতে যাতী নৈকট্য, সংগতা এবং আবেষ্টনীর হুকুম লাগায়। সে তখন ঐ নৈকট্য এবং সংগতার মধ্যে সর্ববস্তুকে একইরূপ মনে করে। ঐ বস্তু, চাই মুমিনের হউক বা কাফিরের, এই নৈকট্য ও সংগতার দর্শন ঐ জামাতের জন্য পূর্বোক্ত হুকুম লাগানোর কারণ স্বরূপ হইয়াছে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা জানেন যে, যদিও হক জাল্লা সুলতানুহুর সহিত কুরব (নৈকট্য) ও মায়ীআত (সঙ্গতা) ধারণা করা হয়ঃ এতদসত্ত্বেও ইহা আবশ্যক নয় যে, তিনি ধারণাকারীর নিকটে বা সঙ্গে। কেননা, নৈকট্য এবং মিলন তো কেবলমাত্র জ্ঞানের অনুপাতে হইয়া থাকে। আর কাফির তো প্রকৃত ইলম হইতে বঞ্চিত। বরং সাধারণ মুমিনদের জন্যও "অছল" শব্দটি প্রযোজ্য নয়, যতক্ষণ না সে বেলায়েতের দর্জায় পৌঁছায় এবং তাহার বাকা বিল্লাহের মাকাম হাসিল হয়, ততক্ষণ সে ওয়াসিল (মিলন লাভকারী নয়)। প্রসিদ্ধ আওলিয়াদের ইহাই অভিমত। যেমন কোন বুজর্গ বলেনঃ

দোস্ত নয্দীক তর আয্ মানস্ বে ও মান্ আস্ত,
দীন আস্ত মুশকিল কে মান আযওয়ে দুরাম।
যত নিকটে আমি আমার সত্তার,
তার চেয়ে অতি কাছে দোস্ত আমার।

কিন্তু এই দূরত্ব হক তায়ালার কুরবকে (নৈকট্যকে) স্বাদ হিসাবে জানার ফলে নয় এবং আমি তো বলি গোমরাহীর এবং মূর্খতার মূল কারণ হইল, এই বান্দা স্বয়ং। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দরবার হইতে তো সর্বক্ষণ মংগল ও হিদায়েতের ফয়েয বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ঐ হিদায়েত, স্থানের দোষযুক্ত হওয়ার ফলে গোমরাহী এবং ভ্রষ্টতার অর্থ প্রকাশ করে– যদিও এই অর্থ হক সুবহানুহু তায়ালার সৃষ্টির ফলেই সৃষ্টি। ইহার উদাহরণ হইল উত্তম খাদ্যস্বরূপ। কেননা, ইহা রোগীদের অসুস্থতার কারণে শারীরিক অসুস্থতাকে আরো বৃদ্ধি করে। কাজেই আল্লাহ্তায়ালার জন্য "আলমুদিল্লু", শব্দটির প্রয়োগ এইরূপে যে, তিনিই তন্মধ্যে গোমরাহীকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই গোমরাহী, আদতে তাহাদেরই সৃষ্টি, যাহা হক তায়ালা সৃষ্টি করাতে সৃষ্টি হইয়াছে। আর ইহা এই জন্য যে, তাহাদের আল্লাহ্তায়ালার

নাম “আলমুদিল্লু” এর সহিত ইহা ব্যতীত আর কোনই সম্পর্ক নাই যে, তিনিই উহার মধ্যে গোমরাহীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই নামের ও উক্ত সৃষ্টকাজ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলে, হক তায়ালা শানুহুর দরবারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আল্লাহ্তায়ালার “আলহাদী” নামের বিপরীত। কেননা, ইহা হইতে দৃষ্টি ফিরান সত্ত্বেও তিনিই তন্মধ্যে হিদায়েতের সৃষ্টি করেন। এই নামটির, যাতে হক তায়ালা ও তাকাদ্দুসের সাথে সম্পর্ক আছে। কেননা, হিদায়েতের উদ্দেশ্য হইল কল্যাণ এবং পূর্ণতা এবং গোমরাহীর উদ্দেশ্য হইল অকল্যাণ এবং ক্ষতি। প্রথমটি, অর্থাৎ হিদায়েত, আল্লাহ-তায়ালার পবিত্র দরবারের জন্য উপযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ গোমরাহী, তাঁহার দরবারের জন্য অনুপযুক্ত। কেননা, হক-তায়ালা তো কেবলমাত্র মংগলময়। বস্তুতঃ গোমরাহীর “মুদিল্লু” এর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই, শুধু এতটুকু ব্যতীত যে, উহা হক তায়ালারই সৃষ্টি। কেননা, উহা কেবলই অমংগল ও অকল্যাণকর এবং উহার বিপরীত হক-তায়ালার যাত কেবলই পূর্ণতা।

অপর পক্ষে, হিদায়াতের “হাদীর” সহিত সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত, অন্য একটি সম্পর্কও আছে। আর সে হইল, উভয়ের মধ্যে কল্যাণ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তি। যেমন, এ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। গোমরাহ্ ব্যক্তির জন্য তো “মুদিল্লু” পর্যন্ত রাস্তাই নাই এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য, “হাদী” পর্যন্ত রাস্তা আছে। কেননা, প্রথম সম্পর্কে অর্থাৎ গোমরাহীতে, এই পর্যায়ের কোন সম্পর্কই পাওয়া যায় না, যাহা উভয়ের মধ্যে সম্মিলিত। অপরপক্ষে দ্বিতীয়, অর্থাৎ হিদায়েতের মধ্যে, উভয়ের মধ্যে সম্মিলিত সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয়। সে কারণেই, হিদায়েত প্রাপ্ত লোক তো, হিদায়েতের কারণেই “হাদী” পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে।

উদাহরণঃ এই বক্তব্যটি, একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যেমন, পিত্তরোগগ্রস্থ রোগীর জন্য, তাহার শারীরিক রুচীর বিকৃতির ফলে, মিষ্ট জিনিস তিক্ত মনে হয়। এই জন্য এইরূপ বলা সঠিক নয় যে, পিত্তরোগাক্রান্ত রোগীর এই তিক্ততার দ্বারাই মিষ্টতার স্বাদ পায়। কেননা, মিষ্টতার মধ্যে তিক্ততার স্বাদ তো আদৌ মওজুদ নাই। বরং ঐ মিষ্টতাই তাহার পিত্তরোগগ্রস্থ হওয়ার ফলে, রুচীর বিকৃতিতে তিক্ত স্বাদের সৃষ্টি করে। যদিও এই তিক্ততা বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয়, তবুও উহা ঐ রোগীর জন্য মিষ্টতার স্বাদ অনুভবের জন্য বাধা স্বরূপ। কাজেই গোমরাহী প্রকৃতপক্ষে, গোমরাহ ব্যক্তির জন্য “মুদিল্লু” পর্যন্ত পৌঁছাইতে বাধা স্বরূপ, ঐ পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ হইলঃ কিব্তী লোক, অন্তরের রোগ এবং মুসা আ. এর সহিত দুশমনীর আধিক্যের ফলে, নীল নদের পানিকে রক্ত হিসাবে পাইত। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই বলিবে না যে, ঐ কিবতী রক্তের মাধ্যমে পানির সন্ধান পাইত। বরং এই খুন তাহার জন্য, পানি পর্যন্ত পৌঁছিতে বাঁধা স্বরূপ হইয়াছে। পানির মধ্যে খুন

(রক্ত) হওয়ার মত আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল না। বরং উহা তো ঐ বিকৃত রুচীর ফলেই সৃষ্ট হইয়াছিল এবং উহার জন্য পানি পর্যন্ত পৌছিতে বাঁধাস্বরূপ হইয়াছিল। ইহাকে ভালভাবে অনুধাবন করুন।

বস্তুতঃ ঐ জামাত তো হক-সুবহানুহুর সহিত বান্দার নৈকট্যের ফয়সালা দিয়াছে। তাঁহারা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেন নাই। কিন্তু জ্ঞানী ও পার্থক্যকারী বিজ্ঞব্যক্তিরা, যথার্থই পার্থক্যকারী। তাঁহারা এমন ফয়সালা দিয়াছেন, যাহা ঘটনার জন্য উপযোগী। সর্বশক্তিমান আল্লাহ-ই অধিক বিজ্ঞ এবং তিনিই সত্যকে, সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেন।

সতর্কতাঃ আর ঐ কথা, যাহা আমি বলিয়াছি, আল্লাহ্‌র পথে পরিভ্রমণকালে সালেকের উপর হক সুবহানুহু তায়ালার নৈকট্য প্রকাশ পায়। আমি উহা এ কারণেই বলিয়াছি যে, মুনতাহী হয্‌রাত (শেষ স্থানে উপনীত ব্যক্তিগণ) বস্তুর সহিত হক-সুবহানুহু তায়ালার নৈকট্যকে জ্ঞানগত নৈকট্য হিসাবে মনে করেন এবং উহার সংগতা ও আবেষ্টনীও জ্ঞানগতই হইয়া থাকে। তাঁহারা এই ব্যাপারে উলামায়ে আহলে-হকদের অনুরূপ এবং তাঁহারা পূর্বোক্ত লব্ধজ্ঞান হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা হক-তায়ালার যাতে সৃষ্টিজগতের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন না এবং ঐ সম্পর্ক যাহা বাস্তবে আছে, উহাকে হক-সুবহানুহু তায়ালার সিফাতের সহিত, নিম্নে লইয়া আসেন। তাঁহারা যাতে হক-তায়ালাকে তুলনাহীন এবং রূপ বর্ণনাহীন হিসাবে মনে করেন। কোন সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা ওই উদ্দেশ্যের বিপরীত। সেই কারণে তাহারা নৈকট্য ও সংগতা, যাহা যাতের হিসাবে, উহাকে তাঁহারা দুইদিক হইতেই অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।



সায়েরের হাকীকত এবং উহার প্রকার সম্পর্কেঃ সায়ের এবং সুলুকের অর্থ ঐ হরকত, যাহা জ্ঞানের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত। এই স্থানে হরকতে আয়নের কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রথম সায়েরঃ বস্তুতঃ সায়ের ইলাল্লাহ্ (আল্লাহর দিকে সায়ের) এর অর্থ হইল- ঐ হরকতে-ইলমীয়া যাহা অধঃজ্ঞান হইতে ঊর্ধ্বজ্ঞান পর্যন্ত গমন করে এবং সেখান হইতে আরো ঊর্ধ্বে গমন করে। এমনকি সর্বশেষ পর্যায়ে, সমস্ত সম্ভাব্য জ্ঞান আহরণের পর, অবশ্যম্ভাবী স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। এই অবস্থাকে "ফানা" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

দ্বিতীয় সায়েরঃ সায়ের ফিল্লাহ্ (আল্লাহ্ তায়ালার মধ্যে ভ্রমণ)- এর অর্থ ইহল- ঐ হরকতে-ইলমীয়া 'যাহা' ওজুবের মর্তবায় হয় এবং উহার সম্পর্ক আসমা, সিফাত, শুয়ুন, পবিত্রতা ও তানাযযীহাতের সাথে হয়। এমনকি সালেক সর্বশেষ পর্যায়ে এমন স্থানে উপনীত হয়, যাহা ভাষায় বর্ণনা করা এবং ইশারায় বলাও সম্ভব নয়। উহার না কোনরূপ নাম রাখা যায়, না উহাকে কোন ইংগিতে প্রকাশ করা যায়। আর না কোন জ্ঞানী সে সম্পর্কে কিছু অনুভব করিতে পারে; আর না কোন অনুভবকারী সে সম্পর্কে কিছু অনুভব করিতে পারে। এই সায়েরকে 'বাকা' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

তৃতীয় সায়েরঃ আর সায়ের আনিল্লাহ বিল্লাহ (আল্লাহর তরফ হইতে আল্লাহ্র সহিত সায়ের), যাহা তৃতীয় পর্যায়ের সায়ের। ইহার অর্থ- ঐ হরকতে ইলমীয়া, যাহা ইলমে আলা হইতে ইলমে আসফালের দিকে নিচে অবতরণ করে এবং পুনরায় নিম্নে হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে এমনকি সালেক সৃষ্টিজগতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশ্যম্ভাবী স্তরের সমস্ত ইলম হইতে নিচে অবতরণ করে। আর ইহাই ঐ সালেক, যিনি আল্লাহর সাথে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভুলিয়া যান এবং আল্লাহ্র সহিত আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। ইনিই প্রাপ্ত হন এবং হারাইয়া ফেলেন। ইনি-ই আল্লাহ্র সহিত মিলিত হন ও বিচ্ছিন্ন হন। আর ইনি-ই আল্লাহ্র নিকটতবর্তী এবং দূরে অবস্থিত।

চতুর্থ সায়ের ঃ আর চতুর্থ সায়ের, যাহাকে "সায়ের দর আশইয়া" (বস্তুর মধ্যে ভ্রমণ) বলা হয় এবং ইহার অর্থ হইল ইলমে-আশইয়া (বস্তু সম্পর্কীয় জ্ঞান) লাভ করা। যাহা প্রকৃতপক্ষে, বস্তু সম্পর্কীয় জ্ঞানুভূতি তিরোহিত হওয়ার পর, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান হাসিল হইতে থাকে, এমনকি সমস্ত বস্তুর ইলম হাসিল হইয়া যায়। বস্তুতঃ চতুর্থ প্রকারের সায়ের হইল প্রথম প্রকার সায়েরের বিপরীত এবং তৃতীয় পর্যায়ের সায়ের হইল- দ্বিতীয় পর্যায়ের সায়েরের বিপরীত। যেমন, আলোচিত হইল।

মর্মকথাঃ আর "সায়ের ইলাল্লাহ্" এবং "সায়ের ফিল্লাহ্", যাহারা বেলায়েতের অধিকারী হন, তাহাদের-ই হাসিল হইয়া থাকে, যাহার অর্থ হইল- ফানা এবং বাকা। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকারের সায়ের, মাকামে দাওয়াত (আহবানের স্তর) লাভ করার জন্যই হইয়া থাকে, যাহা আম্বীয়ায়ে মুরসালীনদের জন্য খাস। আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও সালামতের অবিশ্রান্ত ধারা, তাঁহাদের উপর বিশেষভাবে বর্ষিত হউক। আর আম্বীয়া (আলায়হিমুস সালাম ওয়াস সালাত) দের পূর্ণ অনুসারীগণও মাকামে-দাওয়াতের কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী (কুল হাযিহি সাবীলী, আদউ ইলাল্লাহি আলা বাসীরাতিন আনা ওমা-নিত্তাবাআনী) অর্থাৎ 'হে পয়গম্বর! আপনি বলুন, ইহাই আমার রাস্তা যে, আমি আল্লাহ্র দিকে বাসীরাতের (অন্তর্দৃষ্টির) সহিত দাওয়াত দেই এবং আমার অনুসারীরাও এই দাওয়াত দেয়।



মারেফত একত্রিশ

<u>কাসবী (অর্জিত) তাওয়াজ্জোহের শ্রেষ্ঠত্ব, তাবয়ী (স্বভাবগত) তাওয়াজ্জোহের উপর সম্পর্কেঃ</u> কিছু লোক, যাহারা স্বভাবগতভাবে হুজুর এবং তাওয়াজ্জোহের ক্ষমতা রাখে, আর উহাদের ঐ তাওয়াজ্জোহের মধ্যে কাসবের কোন দখল থাকে না। এমতাবস্থায় ইহার গোপন রহস্য হইল- শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক হওয়ার আগে, এক ধরনের তাওয়াজ্জোহ ও হুজুর হাসিল হয়। অতঃপর উহাকে জড়দেহের সহিত সম্পর্কিত করিয়া দেওয়া হয়, তখন উভয়ের মধ্যে ইশক ও মহব্বতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। এমতাবস্থায়, রূহ্ সম্পূর্ণরূপে শরীরের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং স্বীয় সত্তা ও বিগত অবস্থার কথা বিলকুল ভুলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও হয়, যাহাদের অন্যদিকে খেয়াল প্রবল হওয়া সত্ত্বেও বিগত অবস্থার কথা বিলকুল ভুলিয়া যায় না এবং শরীরের সাথে সখ্যতা স্থাপন হওয়া সত্ত্বেও, উহার প্রভাব স্থায়ী থাকে। বস্তুতঃ ইহা নিশ্চিত যে, উহার এই

ধরনের তাওয়াজ্জোহ্ আমল এবং কাসবের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, যাহারা (পূর্ববর্তী অবস্থাকে) সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে; যদি শরীরের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার পর, তাহাদের কোন উরুজ নসীব হয়; তখন ইহারা পূর্বোক্ত জামাতের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত হয়। যদিও প্রথম দলও উন্নতি করিয়া থাকে। কেননা, তাহাদের (পূর্ববর্তী অবস্থাকে) সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া, অতঃপর স্বীয় মাশুক অর্থাৎ শরীরের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হওয়া, তাহাদের সূক্ষ্ম শক্তিরই পরিচায়ক। আর উহা যাহারই প্রতি মনোযোগী হয়, উহারাই হইয়া যায় এবং উহা ব্যতীত আর সব কিছুকেই ভুলিয়া যায়। আর ইহা ঐ অবস্থার বিপরীত, যাহাতে মানুষ স্বীয় পূর্বাবস্থাকে ভুলিয়া যায় না। কেননা ইহাতে মাশুকের প্রতি মনোযোগী হওয়ার মধ্যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ-সুবহানুহু-ই অধিক জ্ঞানী।



মারেফত বত্রিশ

<u>সাবেকীন (অগ্রবর্তী দল) এবং মাহবুবীনের (আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রগণ) মধ্যে পার্থক্যঃ</u> বস্তুত সাবেকীনদের মধ্যে হুজুর (মনোযোগ) প্রথম হইতেই হাসিল আছে। এই জন্যই সম্ভব যে, এই হুজুর উহাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং উহাদের দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। আর তাঁহাদের বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ রংয়ে রঞ্জিত হয়। কিন্তু মাহবুবদের মধ্যে যে মনোযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, উহা অন্য জিনিস। কেননা, মাহবুব হজরতগণ সম্পূর্ণরূপে স্বীয় অস্তিত্ব হইতে নির্গত হইয়া, উহার সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং উহার ওজুদের প্রতিটি অনু-পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া, উহার সহিত স্থায়ী হইয়াছেন। ইহা সাবেকীনদের বিপরীত। কেননা, তাঁহাদের ওজুদের অস্তিত্ব স্বীয় অবস্থার উপরই বিদ্যমান। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের সাথে অবশিষ্ট আছেন, উহার সহিত নন। অধিকন্তু ইহা বলা যায় যে, তাঁহারা উহার রংয়ে রঞ্জিত হইয়াছেন।



বান্দার কুদরত ও ইখতিয়ার এবং উহার উপর বিনিময়প্রাপ্তি সম্পর্কেঃ হক সুবহানুহু তায়ালার ইরশাদ 'অমা জালামাহুমুল্লাহু অলা-কিন কানূ আনফুসাহুম ইয়াজলিমূন' (আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের উপর জুলুম করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিত)(২ঃ৫৭)। উক্ত আয়াতে হক-সুবহানুহু তায়ালার তরফ হইতে জুলুম না হওয়া এবং উহাদের পক্ষ হইতে জুলুম সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে জুলুম হওয়া, তাঁহার ইরাদা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আর তাঁহার ইরাদা ঐ ইলমের পরে প্রকাশিত হয়, যাহা তাঁহার ভাল-মন্দ সম্পর্কে হাসিল আছে। বস্তুতঃ শরীয়তে ভাল মন্দকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এই ভাল-মন্দ উভয়ই একইভাবে তাঁহার কুদরতের মধ্যে নিহীত আছে। কাজেই প্রথমতঃ বান্দা নিজেই ঐ মন্দ কর্মের ইরাদা করে, যাহার মন্দ হওয়া সম্পর্কে শরীয়তে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর যখন সে উহা সম্পন্ন করিবার জন্য ইরাদা করে, তখন হক-তায়ালা ঐ মন্দকে সৃষ্টি করিয়া দেন। তখন সেই ব্যক্তি নিজেই ঐ ভাল কাজকে পরিত্যাগ করে, যাহা তাহার কুদরতের মধ্যে থাকে এবং যাহার ভাল হওয়া সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহার জানা আছে। সেই জন্য আল্লাহতায়ালা তাহার উপর কোন জুলুম করেন নাই, বরং সে নিজেই নিজের নফসের উপর জুলুম করে।

এখন এই কথা অবশিষ্ট রহিলঃ তাহার (বান্দার) কুদরত ও ইরাদা তো আল্লাহ্ সুবহানুহুর সৃষ্ট। এই কথাটি, তাঁহার পক্ষ হইতে জুলুম হওয়াকে নিষেধ করে না। কেননা, হক তায়ালা সুবহানুহু যে কুদরত সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার সম্পর্ক ভাল-মন্দ উভয়েরই সাথে একইরূপ। এমন নহে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার মধ্যে মন্দের কুদরত (শক্তি) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ভালোর কুদরত সৃষ্টি করেন নাই। যদ্দরুণ, সে মন্দ করিবার জন্য বাধ্য হইয়াছে। একই অবস্থা সৃষ্ট ইরাদারও। কেননা যখন তাহার ভাল-মন্দ উভয়েরই জ্ঞান লাভ হয়, তখন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনটিই সম্পন্ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ বান্দা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাল-

মন্দকে জানা সত্ত্বেও মন্দকে গ্রহণ করে। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাহার কুদরতের সম্পর্ক- ভাল-মন্দ উভয়েরই প্রতি সমভাবে বিদ্যমান ছিল। একইভাবে, ইরাদারও অবস্থা এইরূপ। উভয়ই তাহার কুদরতের মধ্যে বিদ্যমান, এখন যে কোনটিই গ্রহণ করা, তাহার ইরাদার উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ জানা গেল যে, উহার উপর যে জুলুম হইয়াছে- উহা তাহার নফসেরই কৃত এবং হক তায়ালা সুবহানুহু, তাহার উপর কোন জুলুম করেন নাই।

এই অবস্থা অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত তকদীরের। আর এই দুইটি বান্দা হইতে জুলুম কে নফী (নিষেধ) করে না। কেননা, হক তায়ালা জানাইয়াছেন এবং সৃষ্টির আদিতে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন যে, আমুক বান্দা তাহার আমলের মধ্যে, মন্দকে গ্রহণ করিবে এবং ভালকে পরিত্যাগ করিবে এবং এ সবই তাহার ইচ্ছানুযায়ী করিবে। বস্তুতঃ ইলম এবং কাযা (তকদীর) বান্দার মুখতার হওয়াকে মজবুত করে, উহাকে নফী করে না। ইহা এমনইঃ যেমন কোন ব্যক্তির কাশফের বদৌলতে, গায়েবের কোন ইলম হাসিল হইল। অতঃপর সে উহা জ্ঞাত হওয়ার পর বলিল, অমুক ব্যক্তি অদূর ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় এই কাজটি করিবে। এমতাবস্থায়, এই ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান এবং ফয়সালা, যেরূপ ঐ বান্দার ইখতিয়ারকে নফী করে না, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র ইলম ও ফয়সালাও উহাকে নফী করেনা। আল্লাহ্‌তায়ালাই আসল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। সায়্যেদেনা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

বস্তুতঃ এই বিষয়টি ইলমে কালামের (দর্শন শাস্ত্রের) জটিলতম ব্যাপার। কিছু আলিম ব্যতীত অন্যেরা এ সম্পর্কে জ্ঞানই রাখে না। আর হক-তায়ালা সুবহানুহুই তওফীক প্রদানকারী।



কুতুবে-আবদাল ও কুতুবে-ইরশাদের ফয়েজঃ কুতুবে আবদাল ঐ সমস্ত ফয়েজ ও বরকত পৌঁছানোর মাধ্যম, যাহা আলমের ওজুদ (অস্তিত্ব) এবং উহার বাকার (স্থায়িত্বের) সহিত সম্পৃক্ত। অপরপক্ষে, কুতুবে-ইরশাদ ঐ সমস্ত ফয়েজ ও

বরকত পৌঁছানোর মাধ্যম, যাহা দুনিয়ার ইরশাদ ও হিদায়েতের সহিত সম্পর্কিত। বস্তুতঃ সৃষ্টি, রিযক পৌছান, বালা-মুছীবত দূরীকরণ, ব্যাধি দূরীকরণ এবং সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণলাভ ইত্যাদি কুতুবে আবদালের বিশেষ ফয়েজের সহিত সংশ্লিষ্ট। অপরপক্ষে, ঈমান ও হিদায়েত, ভাল কাজের তওফীক এবং মন্দ হইতে প্রত্যাবর্তন বা তওবা করণ ইত্যাদি কুতুবে-ইরশাদের ফয়েজের-ই ফলশ্রুতি।

বস্তুতঃ কুতুবে-আবদাল সবসময়ই কর্মব্যস্ত থাকেন এবং উহা হইতে দুনিয়ার খালি হওয়া সম্পর্কে চিন্তাও করা যায় না। কেননা, দুনিয়ার শান্তিশৃঙ্খলা উহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। যদি এই ধরনের কুতুবের মধ্যেকার কোন কুতুব চলিয়া যান (অর্থাৎ ইনতিকাল করেন), তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু কুতুবে-ইরশাদের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, তিনি সবসময়ই উপস্থিত থাকিবেন। এক সময় এমনও হইতে পারে যে, সমস্ত দুনিয়া ঈমান ও হিদায়েত হইতে বিলকুল খালি হইবে। আর পূর্ণতার দিক দিয়া এই সমস্ত কুতুবদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু এই পার্থক্য, উহাদের সকলের বেলায়েতের দরজায় পৌঁছিবার পর। আকতাবে ইরশাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচাইতে অধিক পূর্ণতার অধিকারী, তিনি শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কদমের উপর হন এবং ঐ ব্যক্তির কামালত রসুলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কামালের অনুরূপ হয়। আর এই দুইজনের মধ্যেকার পার্থক্য হইল আসল এবং উহার অনুসারীর ন্যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ রসুলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনিই ছিলেন কুতুবে ইরশাদ এবং সেই সময় কুতুবে-আবদাল ছিলেন হজরত উমর ফারুক রা. এবং হজরত আওস্ কুরুনী র.।

<u>**কুতুবে ইরশাদ হইতে ফয়েজ পৌঁছানোর তরীকাহঃ**</u> অন্যান্য কুতুব হইতে দুনিয়ার ফয়েজ পৌঁছানোর তরীকাহ্ হইল- কুতুব স্বীয় অর্জিত (জামেয়ীআতের) সমষ্টির ফলে, ফয়েজের উৎসস্থলের জন্য, সূরত ও ছায়ার অনুরূপ হইয়া গিয়াছে; আর সমস্ত দুনিয়া ঐ কুতুবে-জামিইর ব্যাখ্যা-স্বরূপ। বস্তুতঃ কোন ভনিতা ব্যতীতই হাকীকত হইতে সুরত পর্যন্ত ফয়েজ পৌঁছায় এবং সূরতে জামেআ (কুতুব) হইতে –দুনিয়া পর্যন্ত, কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ফয়েজ পৌঁছিয়া থাকে; যাহা উহার ব্যাখ্যা-স্বরূপ। আর আসল ফয়েজের মালিক তো আল্লাহ্তায়ালাই। সেই জন্য কুতুবের এই ফয়েজ পৌঁছানোর মধ্যে, কোনরূপ কারিগরী নাই। বরং এইরূপও হইয়া থাকে যে, মধ্যস্থতাকারী-কুতুবেরও এই ফয়েজ পৌঁছানোর কোন খবর-ই থাকে না। যেমন কোন কবির ভাষায়ঃ

আয্ মা ও শুমা বাহাবাহ্ বর্-সাখ্নাহ্ আন্দ্ অর্থাৎ আমার ও তোমাদের মধ্যে ইহা একটি বাহানা মাত্র।

প্রশ্নঃ যদি কেহ বলে, ঈমান ও হিদায়েতের নিস্‌বত তো সমস্ত মাখ্‌লুকাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়; কাজেই, কুতুবে-ইরশাদের ফয়েজ সকলের জন্য নয়, বরং উহা আহলে ঈমান ও হিদায়েতের সহিত খাস্‌ হইবে। বস্তুতঃ শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তো সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত-স্বরূপ এবং ইহার সাথে তিনি কুতুবে-ইরশাদও (যেমন আপনি বলিয়াছেন); এমতাবস্থায় ইহার জবাব কি?

উত্তরঃ ইহার জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, ফয়েজের উৎস হইতে, যাহা কিছু ফয়েজ পৌঁছায় এবং বিস্তৃতি লাভ করে– উহার সবই খায়ের, বরকত, আর ঈমান ও হিদায়েতই। মন্দ ও অকল্যাণের কোন সম্ভাবনা এখানে আদৌ নাই। চাই সে ফয়েজ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাক অথবা দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি পর্যন্ত। কিন্তু ঐ হিদায়েত ও ইরশাদ স্থানের কলুষতার কারণে ফাসাদপ্রিয় লোকদের মধ্যে গোমরাহী ও দুষ্টামির সৃষ্টি করে। আর উহা এইরূপ, যেমন উত্তম খাদ্য মানুষ অসুস্থ হওয়ার কারণে, উহা তাহার জন্য প্রাণ-বিনাশকারীও হইতে পারে। বস্তুতঃ ফাসাদপ্রিয় লোকদের মধ্যে ঐ হিদায়েত, উহাদের আত্মিক রোগের কারণে, গোমরাহীর সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন, নীল দরিয়ার পানি, উহা হজরত মুসা আ. এবং তাহার অনুসারীদের জন্য ছিল পানি এবং ফেরাউন এবং তাহার অনুসারীদের জন্য ছিল রক্তস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, উহা তো পানিই ছিল, কিন্তু কিব্‌তীরা উহা দেখিত রক্ত হিসাবে। আর তাহাদের এই রক্তস্বরূপ দেখার কারণ ছিল, তাহাদের খাবাছাত। পানি আদৌ দূষিত ছিল না। উপরন্তু, পিত্তরোগগ্রস্ত রোগী, যে মিষ্টতাকে তিক্ত অনুভব করে। ইহা তাহার শারীরিক বৈকল্যেরই ফলশ্রুতি। আসলে মিষ্টতার মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয় না। বরং সে অসুস্থতার কারণে এইরূপ অনুভব করে। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, যাহা কিছুই হক্‌ তায়ালা ও তাকাদ্দুসের পক্ষ হইতে পৌঁছায়, উহার সবই খায়ের, বরকত, উত্তম এবং সত্য পথের দিশারী। কিন্তু ঐ খায়রীয়াত, ফাসাদের স্থানে অকল্যাণের সৃষ্টি করে। কাজেই, হক-সুবহানুহু তায়ালার উপর "মুদিল্লুর" (গোমরাহকারীর) প্রয়োগ এই অর্থেই হয় যে, কলুষ পরিবেশ যে ফিতনা ফাসাদ দাবী করে, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর জুলুম করেন নাই, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের নাফসের উপর জুলুম করিত (আল-কোরআন)।

<u>**কাযা ও কদরের গোপনতত্ত্বঃ**</u> যদি লোকেরা বলে, কলুষ পরিবেশ কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, মানুষের শরীর চারিটি উপাদানে গঠিত। আর প্রত্যেকটি উপাদান, যাহা মানুষের শরীরের অংশ, উহা এক ধরনের বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী। যেমন– আগুনের অংশ উচ্চতা ও হঠকারিতা দাবী করে এবং মাটির অংশ নীচতা ও বিনয়ের দাবী করে। এ ধরনের অন্যান্য উপাদানও ।

বস্তুতঃ এই উপাদানগুলির সংমিশ্রণে প্রত্যেক ব্যক্তি, যে মিতাচারের নিকটবর্তী হয়, তাহার সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের সাথে অধিক হইয়া থাকে। আর এই সম্পর্কের কারণে, এ ধরনের ব্যক্তি খায়ের, বরকত ও রুশ্দ হিদায়েতের অধিক উপযুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি মিতাচার হইতে অধিক দূরে থাকে, তন্মধ্যে কোন একটি অংশের বৈশিষ্ট্য অধিক হইয়া থাকে এবং কোন অংশের বৈশিষ্ট্য কম হইয়া থাকে। আর এইরূপ হওয়ার ফলশ্রুতিতে, তাহাদের সাথে হক তায়ালার সহিত সম্পর্ক কম হয়। সে কারণে, অবশ্যই খায়ের বরকত এবং এ ধরনের বৈশিষ্ট্য তাহাদের কম নসীব হয়। কলুষ পরিবেশের অর্থ হইল- শরীরের মধ্যে কলুষতার সৃষ্টি হওয়া এবং ঐ মিতাচার নষ্ট হওয়া। আর যে রূহ্ এই সংমিশ্রিত অংশের সহিত হয়, সে উহার যাতের দিক দিয়া, এই ধরনের মিশ্রণ হইতে মুক্ত। কেননা, ইহা অবিভাজ্য এবং এই মিশ্রণ বিভাজ্যের মধ্যে হইয়া থাকে। কিন্তু, হক তায়ালা উহাকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে উহার অনুরূপ বানাইয়া নেয়। সে কারণে, প্রতিবেশীর (শরীরের) অনিষ্টতার ফল, রূহের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, ফিরিশতা স্বীয় অবিভাজ্যতার কারণে, দুষ্টামি এবং এই ধরনের বস্তু হইতে পবিত্র ও মুক্ত। আর এই দিক দিয়াও যে, তাহাদের এই ধরনের সংমিশ্রণের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, যাহার মধ্যে কলুষতা ও আবিলতা আছে। যদিও এইরূপ ধরিয়া নেওয়া যায় যে, কিছু ফিরিশতার মধ্যে মন্দের প্রভাব বিদ্যমান আছে; তবে ইহার বৈধতার কারণে, কিছু সংখ্যক ফিরিশতার মধ্যে, কিছু মিশ্রণের সাথে, উহার সম্পর্ক হইতে পারে। যদিও এই সম্পর্ক খুব কমই হয়। আর এই ধরনের সম্পর্ককে একেবারেই অস্বীকার করা, কেবলমাত্র জিদ ও হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতঃপর আমার বক্তব্য এই যে, হক-সুবহানুহু তায়ালা অপ্রকৃত অবিভাজ্য বস্তুর মধ্যেও সংমিশ্রণ ও সমন্বয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদিও এই মিশ্রণের এবং সমন্বয়ের ধরন আলাদা। আর যেইরূপে অবিভাজ্য বস্তুর প্রতিটিই কোন কাজের দাবী রাখিত, সেইরূপে প্রত্যেক সমন্বয়ও কোন না কোন কাজের দাবীদার হইয়াছে। অতঃপর হক তায়ালা, এই সমন্বয়ের যে দাবী ছিল, উহাও সৃষ্টি করেন। কাজেই ঐ অনিষ্টতা, উক্ত সংমিশ্রিত যাতের জন্য আবশ্যক হয় এবং ইহাকে সৃষ্টি করারও হক তায়ালার যাতের প্রতি, কোন ধরনের খারাবী ও অনিষ্টতা সম্পর্কিত হইতে পারে না। বরং কথা এতটুকু যে, হক তায়ালাই যাবতীয় খারাবী ও

অনিষ্টতার স্রষ্টা মাত্র। আর কোন খারাপ জিনিসকে সৃষ্টি করা, মন্দ কিছু নয়, বরং খারাবী ও অনিষ্টতা ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতিই সম্পর্কিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কল্যাণ ও মংগল, হক সুব্হানুহু তায়ালার সহিতই সম্পর্কিত। আর ইহাই হইল তাক্দীর সম্পর্কিত বিষয়ের গোপনতত্ত্ব। যদি ইহাকে গ্রহণ করা হয়, তবে ইহাতে দোষের কিছুই নাই। আর এই ফয়সালা ইজাবে শায়েবাহ অর্থাৎ ঐ কথার মিশ্রণ হইতে পবিত্র যে, হক তায়ালার জিম্মায় বস্তুতঃ এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, যাহাতে ইহার গোপনতত্ত্ব তোমাদের নিকট প্রকাশিত হয় এবং তোমাদের আহলে-বিদয়াত ও পথভ্রষ্টদের অসৎ বিশ্বাস হইতে নাজাত হাসিল হয়। আর আল্লাহ্তায়ালাই সত্যকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনিই সত্যপথ প্রদর্শন করেন। আর এই গোপনতত্ত্ব ঐ সমস্ত গোপনতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, যাহা হক তায়ালা আমাকে ইলহামের দ্বারা অবহিত করান, বরং তিনি আমাকে ইহার জন্য নির্ধারিত করেন। সেই জন্য আল্লাহ্তায়ালার যাবতীয় প্রশংসা। আর তাঁহারই অনুগ্রহ, এই ইনামের উপর এবং বাকী সমস্ত পুরস্কারের উপর।

প্রশ্নঃ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, হক সুবহানুহু তায়ালা, স্বীয় অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা ইহা জানিতেন যে, এই ধরনের মিশ্রণের ফলশ্রুতি হইবে, ফাসাদ ও অনিষ্টতা। এমতাবস্থায়, তিনি এই ধরনের মিশ্রণকে কেন সৃষ্টি করেন?

জবাবঃ ইহার জবাব এই যে, প্রশ্নটি তাহাদের উপর বর্তে যাহারা হক সুবহানুহুর উপর ইহা ওয়াজিব মনে করেন যে, তিনি কেবলমাত্র ভাল জিনিসই সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু, আমরা তো কোন কিছুকেই, হক তায়ালার জন্য ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক মনে করি না। বরং তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন। আর তিনি যেমন ইচ্ছা, তেমনই ফয়সালা করেন। তিনি যাহা কিছুই করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে জবাবদিহী করিতে হয় না। অপরপক্ষে, সকল লোককে অবশ্যই জবাবদিহী করিতে হইবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের উপর সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বকারী। কাজেই, বান্দাদের কোন হুকুমই, তাঁহার উপর চলে না, যদ্দরুণ উহা সম্পূর্ণ করা তাঁহার জন্য জরুরী হইতে পারে। বরং তিনিই একমাত্র হুকুমের মালিক এবং তাঁহার নির্দেশ পালন করা, বান্দাদের উপর অপরিহার্য।

সারকথা এই যে, সমস্ত অনিষ্টের মূল হইল মাখলুক। ইহার সৃষ্টিকর্তা হক তায়ালা, যাহার শান খুবই বুলন্দ। তিনি যাবতীয় অত্যাচার অবিচার অনিষ্টতা হইতে পুতঃপবিত্র। সাধারণ লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যাহা বলে, আল্লাহ্ তাবরাক তায়ালার যাত উহা হইতে পবিত্র এবং খুবই বুলন্দ। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।



<u>বেলায়েত, শাহাদাত ও সিদ্দীকীয়াতের জ্ঞানের পার্থক্য সম্পর্কেঃ</u> জানা উচিৎ যে, বেলায়েত, শাহাদাত এবং সিদ্দীকীয়াতের স্থানসমূহের মধ্যে প্রত্যেক মাকামের জ্ঞান এবং মারেফাতসমূহ বিভিন্ন; যাহা ঐ মাকামের সংগে সম্পর্কিত। বেলায়েতের মাকামের জ্ঞানসমূহ অধিকাংশ মত্ততাযুক্ত হইয়া থাকে। কেননা, এই মাকামে মত্ততা অধিক এবং হুঁশ বা বোধ কম হইয়া থাকে। আর শাহাদাতের মাকাম, যাহা বেলায়েতের দরজার দ্বিতীয় পর্যায়ের; এখানে মত্ততা কম এবং হুঁশ অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু মত্ততা একেবারে দূরীভূত হয় না। আর সিদ্দীকীয়াতের মাকাম, যাহা বেলায়েতের দরবারে তৃতীয় পর্যায়ের এবং বেলায়েতের দরজার সর্বশেষ স্তর, ইহার উপরে বেলায়েতের কোন দরজা নেই। বরং ইহার উপরে হইল নবুওয়াতের স্তর। এই স্তরের জ্ঞানসমূহ মত্ততা হইতে বিলকুল খালি এবং শরীয়তের জ্ঞানসমূহের অনুরূপ হইয়া থাকে। সিদ্দীক এই শরীয়তের জ্ঞানসমূহ ইলহামের মাধ্যমে হাসিল করিয়া থাকেন, যেমন নবী (আলায়হিস সালাত ওয়াসসালাম) গণ ওহীর মারফৎ লাভ করিতেন। সিদ্দীক এবং নবীর পার্থক্য, হাসিল করিবার রাস্তার মধ্যে; গ্রহণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়েই হক তায়ালা হইতে হাসিল করেন। কিন্তু সিদ্দীক, নবীর অনুসরণের ও অনুকরণের দ্বারা এই দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকেন। কাজেই, নবীই আসল এবং সিদ্দীক উহার শাখা সদৃশ্য। অপর পক্ষে, নবীর জ্ঞানসমূহ নিশ্চিত জ্ঞান হইয়া থাকে এবং সিদ্দীকের জ্ঞান অনিশ্চিত। বস্তুতঃ নবীর জ্ঞানসমূহ অন্য সবের উপর দলিলস্বরূপ হইয়া থাকে এবং সিদ্দীকের জ্ঞানসমূহ অন্য সবের উপর দলিলস্বরূপ হয় না। যেমন কোন কবির ভাষায় ঃ

দর কাফেলাহে কে-উস্ত দানাম নারসাম
ই-বাস্ কে-রাসাদ্ যে-দূরে বান্‌গে জারসাম।

অর্থাৎ জানা আছে মোর, চিনবনা তারে, সে যে কাফেলার সাথী, মোর তরে এই-ই যথেষ্ট যে দূরের–ঘণ্টা ধ্বনি শুনি।

আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও সালামতসমূহ নাযিল হউক আমাদের নবী স. এবং সমস্ত আম্বীয়ায়ে মুরসালীনদের উপর, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের উপর এবং সমস্ত অনুগত বান্দাদের উপর।

বস্তুতঃ এই রেছালায় যদি কিছু ইলম এবং মারেফাত পরস্পরবিরোধী স্বরূপ আসিয়া থাকে, এমতাবস্থায় এই সমস্ত উলুমের পার্থক্যকে, বেলায়েতের দরজার মধ্যে পার্থক্যের ফলস্বরূপ মনে করিতে হইবে। কেননা, প্রত্যেক দরজার জ্ঞান বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন আমি ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতেছি। একত্ববাদের জ্ঞান বেলায়েতের দরজার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর যদি শাহাদাতের দরজার জ্ঞান ও মারেফাতসমূহ হাসিল করিতে চাও, তবে ঐ মারেফাত যাহা কোরআনে উল্লেখ আছে "তাঁহার অনুরূপ কিছুই নাই" ইহাকে উত্তমরূপে অর্জন কর। কেননা, এই মাকামের জ্ঞান হইল শাহাদাতের মাকামের জ্ঞানস্বরূপ। বস্তুতঃ সালেক এই মাকামে, স্বয়ং নিজেকে এবং নিজের সিফাতকে বিলকুল মৃত পাইয়া থাকে। এই জন্যই মাকামের নামকরণ, মাকামে শাহাদাত হিসাবে করা হইয়াছে। উলুমে-সিদ্দিকীয়াই হইল উলুমে-শরীয়াহ্, যেমন উপরে আলোচিত হইয়াছে। আর সত্য এবং গ্রহণীয় জ্ঞান উহাই, যাহা শরীয়তের ইলমের অনুরূপ। হক সুবহানুহু তায়ালা আমাদিগকে উজ্জ্বল শরীয়তের উপর, সাহেবে-শরীয়ত হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তোফায়েলে সুদৃঢ় রাখুন।



মারেফত ছত্রিশ

<u>মা-সেওয়া হইতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকরণ সম্পর্কেঃ</u> আমাদের জন্য যাহা অপরিহার্য, উহা হইল হক সুবহানুহু ব্যতীত অন্য সব কিছুর আকর্ষণ হইতে, স্বীয় আত্মাকে মুক্ত ও মাহফুজ রাখা। আর এই নিরাপত্তা তখনই হাসিল হয়, যখন হক-সুবহানুহু ব্যতীত, অন্য কিছু অন্তরে স্থান না পায়। বস্তুত, যিন্দেগী যদি হাজার বৎসরও দীর্ঘ হয়, তবে এইরূপ ভুলের কারণে যাহা অন্তরের 'মা-সেওয়া' হইতে হাসিল হইয়াছে, অন্য কিছুরই চিন্তা অন্তরে স্থান পাইবে না। যেমন কোন কবি বলেনঃ

কারেই- আস্ত, গায়েরই - হামাহ্ হীচ,
অর্থাৎ ঃ ইহাই কাজ, আর যা তা নগণ্য খুবই।



মাকামে সিদ্দীকীয়াতের প্রান্তসীমা সম্পর্কেঃ কোন কোন বিখ্যাত শায়েখ বলিয়াছেন, সিদ্দীকিনদের মস্তিষ্ক হইতে সর্বশেষে যাহা নির্গত হয়, উহা হইল হুব্বে-জাহ্ (উচ্চ পদ লাভের বাসনা) এবং হুব্বে-রিয়াসাত (সাম্রাজ্য লিপ্সা)। কিছু লোক এই জাহ্ ও রিয়াসাত হইতে, প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ অর্থের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হুব্বে-জাহ্ ও রিয়াসাত অন্তর হইতে নির্গত হওয়াই হইল– সিদ্দীকীয়াতের মাকামের প্রথম স্তর। কিন্ত এই ফকিরের নিকট যাহা প্রতীয়মান হইয়াছে, উহা হইল- হুব্বে-জাহ্ ও হুব্বে-রিয়াসাতের এমনও এক ধরন আছে, যাহা নাফসের সাথে সম্পর্কিত। আর ইহার মধ্যে সামান্যতমও সন্দেহ নাই যে, যতক্ষণ না এই মন্দ স্বভাব নফস হইতে দূরীভূত হয়, ততক্ষণ সে বেলায়েতের মাকামে পৌঁছিতে পারিবে না। উপরন্তু, সিদ্দীকীনদের মাকামে পৌঁছান তো অনেক বড় কথা। বক্তার উদ্দেশ্য, এই ধরনের জাহ্ ও রিয়াসাত নয়। জাহ্ এর অন্য একটি প্রকার আছে, যাহার সম্পর্ক হইল লতীফায়ে-কালেবের সাথে। আর উহা হইল ঐ কালেবের আগুনের অংশ, যাহা বুলন্দী ও সম্মানের আকাংখী হয় এবং উহার স্বভাব হইতে "আনা খায়রুম মিনহু" (আমি তাহার চাইতে উত্তম)- এই ধ্বনি নির্গত হইতে থাকে। এই ধরনের জাহ্ মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া যাওয়া, নাফসের প্রশান্তি হাসিলের পর এবং বেলয়েতের দরজায় পৌঁছানোর পর, বরং সিদ্দীকীয়াতের মাকাম লাভের পর স্থিতিশীল হয়। কাজেই, বক্তার উদ্দেশ্য ও রিয়াসাতের এই প্রকার, যাহা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হওয়াই সিদ্দীকীয়াতের সর্বশেষ সীমা এবং ইহা মুহাম্মদী-উল-মাশরাব আওলীয়ায়ে কিরামদের জন্য খাস।

আর যে শয়তানের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "আসলামা শয়তানী" অর্থাৎ আমার শয়তান মুসলমান হইয়া গিয়াছে– ইহার সম্পর্ক ঐ বুলন্দ মাকামের সাথে, যাহা আরবাবে-সুলুকদের

নিকট গোপন নয়। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্‌ বড়ই ফযলওয়ালা। আর আল্লাহ্‌ তায়ালার রহমত, বরকত ও কল্যাণসমূহ নাযিল হউক আমাদের নেতা হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তাঁহার বংশধর ও সাহাবীদের উপর।



মারেফত আটত্রিশ

<u>হজরত মুজাদ্দিদ র. এর জযবা ও সুলুক সম্পর্কেঃ</u> জানা কর্তব্য যে, ইনায়েতে ইলাহী জাল্লা-সুলতানুহু সর্বপ্রথম আমাকে তাঁহার প্রতি আকর্ষিত করেন, যেমন মুরাদের মাকামে উপনীত ব্যক্তিদেরকে আকর্ষিত করা হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে, আমার জন্য এই জযবা, সুলুকের মঞ্জিল অতিক্রমণ সহজ করিয়া দেয়। বস্তুতঃ প্রথমাবস্থায় আমি হক তায়ালার যাতকে, বস্তুর অনুরূপ প্রাপ্ত হই, যেমন পরবর্তীকালের সুফিয়ায়ে কেরাম (তওহীদে-ওজুদীর মাকামে উপনীত ব্যক্তিগণ) এরশাদ করিয়াছেন। অতঃপর আমি হক তায়ালাকে সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রাপ্ত হই, এমতাবস্থায় যে, তিনি উহাদের মধ্যে হলুল বা প্রবেশ করেন নাই। পরে আমি হক তায়ালাকে মায়ীয়াতে যাতিয়া হিসাবে, সমস্ত বস্তুর সাথে অনুভব করি। অতঃপর আমি হক তায়ালাকে সমস্ত বস্তুর পরে প্রাপ্ত হই। পরে সব বস্তুর প্রথমে পাই। অতঃপর আমি হক তায়ালা সুবহানুহুকে অবলোকন করি, আর সেখানে কোনকিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহাই হইল তওহীদে শুহুদীর অর্থ, যাহাকে ফানা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বেলায়েতের রাস্তায় ইহাই প্রথম পদক্ষেপের স্থান। আর ইহাই ইল কামালাতের সর্বশেষ স্তর, যাহা প্রথমে হাসিল হইয়া থাকে। আর এই দর্শন, যাহা আলোচিত স্তরসমূহের যে কোন স্তরেই প্রকাশ পাইতে পারে, প্রথমে ইহা বহির্জগতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্জগতে প্রকাশ পায়।

অতঃপর আমি বাকার স্তরে উন্নীত হই, যাহা বেলায়েতের রাস্তায় দ্বিতীয় পদক্ষেপস্বরূপ। পরে আমি সমস্ত বস্তুকে দ্বিতীয়বার অবলোকন করি এবং আমি হক তায়ালা সুবহানুহুকে এই সমস্ত বস্তুর অনুরূপ প্রাপ্ত হই, বরং আমার নিজের মতই পাই। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌তায়ালাকে সমস্ত বস্তুর মধ্যে দেখি, বরং স্বয়ং

আমার নাফসের মধ্যে অবলোকন করি। পরে বস্তুর সাথে, বরং আমার নিজের সাথেই দেখি, অতঃপর বস্তুর প্রথমে বরং নিজেরও প্রথমে অবলোকন করি। পরে আমি হক তায়ালাকে বস্তুর পশ্চাতে দেখি, বরং আমি আমাকে পরে অবলোকন করি। অতঃপর আমি বস্তুই দেখিতে পাই এবং আল্লাহ্ তায়ালাকে আদৌ দেখিতে পাই নাই। আর ইহাই ছিল সর্বশেষ পদক্ষেপ, যেখান হইতে প্রথম পদক্ষেপের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। আর এই মাকাম হইল মাখলুককে হক সুবহানুহুর দিকে দাওয়াত দেওয়ার এবং আহবান করিবার জন্য পরিপূর্ণ মাকাম। আর এই মঞ্জিলই পূর্ণরূপে হাসিল হয়। কেননা, পূর্ণ দর্জার ফায়দা পৌঁছান এবং ফায়দা হাসিল করিবার জন্য ইহাই প্রয়োজন। আর ইহাই আল্লাহ্র ফযল; তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ বড়ই ফযলওয়ালা। আর আলোচিত সমস্ত অবস্থা এবং লিখিত সমস্ত কামালাত আমার হাসিল হয়। বরং ইহা ঐ সমস্ত ব্যক্তিরই হাসিল হইয়া থাকে, যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও পরিপূর্ণ মানব হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তোফায়েলের সহিত সম্পৃক্ত। ইয়া আল্লাহ্! আমাদিগকে আপনার অনুসরণের উপর সুদৃঢ় রাখুন এবং আমাদের হাশর, আপনার-ই দলের সাথে করুন। (তাঁহাদের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক)। ইয়া আল্লাহ! আপনি ঐ বান্দার প্রতি রহম করুন, যে আমার এই দোয়ার প্রতি আমীন বলে। তাঁহাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক– যাঁহারা হিদায়েতের অনুসরণ করেন।



মারেফত উনচল্লিশ

<u>নকশবন্দীয়া সিলসিলার ফযীলত সম্পর্কেঃ</u> নকশবন্দীয়ার মহান সিলসিলা কয়েকটি ফযীলতের কারণে অন্য সমস্ত সিলসিলা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং এই মহান তরীকার প্রাধান্য অন্য সমস্ত তরীকার উপর স্বীকৃত। এই মহান সিলসিলা, অন্যান্য সিলসিলার বিপরীত; হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপর সমাপ্ত হয়, যিনি সমস্ত নবীদের পরে বনী আদমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য তরীকার বিপরীত এই তরীকায় সর্বপ্রথমেই সর্বশেষ অবস্থা নিহীত আছে (ইনদিরাজুন নিহায়েত দর বিদায়েত)।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য তরিকার বিপরীত, এই তরিকার বুজুর্গদের নিকট যাহা প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণীয়, ইহা হইল 'মাশহুদে দায়েমী' (স্থায়ী দর্শন), যাহাকে ইহারা ইয়াদ-দাশত (বিরতিহীন স্মরণ) হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর যে দর্শন দায়েমী নয়, উহা এই বুজুর্গদের নিকট গ্রহণীয় নয়। বস্তুতঃ এই তরীকার মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করা, সাহেবে শরীয়ত মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়। ইহা অন্যান্য তরীকার বিপরীত, কেননা তাহারা যথাসম্ভব অনুসরণের দ্বারা, রিয়াযাত ও মোজাহিদার সাহায্যে 'ইনকিতার' (দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি) মাকাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকেন। এই দাবির সমর্থনে দলিলের প্রয়োজন। আর দলিল হইল- এই বুজর্গেরা কেবলমাত্র জযবার সাহায্যে রাস্তা অতিক্রম করেন এবং দ্বিতীয় পন্থায় কষ্টসাধ্য রিয়াযত ও মুজাহিদার সাহায্যে মঞ্জিলসমূহে অতিক্রান্ত হয়। আর জযবা মাহবুবিয়াতের গুণাবলী দাবী করে। যতক্ষণ না মানুষ মাহবুব হয়, ততক্ষণ জযবার উপযোগী হয় না। আর মাহবুবিয়াতের হাকীকত, মাহবুবে রব্বুল আলামীন আলায়হি ওয়া আলা আলিহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পূর্ণ অনুসরণের সহিত সম্পৃক্ত। যেমন, আল্লাহর বাণী- 'ফাত্তাবিউনী-ইয়ুহবিবকুমুল্লাহ্' অর্থাৎ আমার অনুসরণ কর, আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে মহব্বত করিবেন। এই আয়াতটি উপরোক্ত বক্তব্যের দলিল স্বরূপ।

বস্তুতঃ অনুসরণ যতই পরিপূর্ণ হইবে, ততই মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করা সহজ হইবে। কাজেই, অনুসরণ এবং পায়রবী ঐ সমস্ত বুজর্গদের তরীকার জন্য শর্তস্বরূপ। এইজন্যই এই তরীকার বুজর্গগণ যথাসম্ভব আযীমতের উপর আমল করিয়াছেন। এমনকি প্রকাশ্য যিকির, যাহা তরীকতের রাস্তায় অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাকেও নিষেধ করিয়াছেন। আর সিমা ও রাকস (নৃত্য) যাহা হালপ্রাপ্তদের নিকট খুবই প্রিয়, এই বুজর্গগণ উহাও পরিহার করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যে পূর্ণতা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল, উহা অন্যান্য যাবতীয় কামালাত হইতে উচ্চ পর্যায়ের। আর ইহার কারণ এই যে— সমস্ত বুজর্গগণ বলিয়াছেন, আমাদের তরিকার নিসবত অন্যান্য যাবতীয় তরিকার নিসবত হইতে শ্রেষ্ঠ। আর ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফযল। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ বড়ই ফযলওয়ালা। কাজেই সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের জন্য এই তরিকা গ্রহণ করা সর্বোৎকৃষ্ট এবং সব চাইতে অগ্রগণ্য। কেননা, এই রাস্তাটিই সব চাইতে নিকটবর্তী। অপরপক্ষে আকাঙ্খিত বস্তু খুবই বুলন্দ। আল্লাহ্ সুবহানুহু-ই তওফীক প্রদানকারী।



<u>নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ফযীলত সম্পর্কেঃ</u> হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমস্ত আদম সন্তানদের সরদার এবং মনিব। আর কিয়ামতের দিন তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক হইবে। তিনিই আল্লাহ্তায়ালার নিকট সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী। কিয়ামতের দিন, তিনিই সর্বপ্রথম কবর শরীফ হইতে বাহির হইবেন। তিনিই সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী হইবেন এবং সর্বাগ্রে তাঁহার সুপারিশ কবুল করা হইবে। তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করিবেন এবং উহা তাঁহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র প্রশংসার ঝাণ্ডা তাঁহারই হাতে থাকিবে এবং ঐ ঝাণ্ডার নিচে হজরত আদম আ, সমস্ত আম্বীয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস সালাম এবং সমস্ত লোক থাকিবে। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই ইরশাদ করিয়াছেন, 'নাহনুল আখিরুন্নাস সাবিকুনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি' অর্থাৎ আমি (দুনিয়াতে) সব (নবীদের) শেষে আগমন করিয়াছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন সকলের আগে থাকিব। আর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করিযাছেন, আমি গৌরব ব্যতিরেকেই বলিতেছি যে, আমিই আল্লাহ্র হাবীব। আমি রসুলদের নেতা আর এ ব্যাপারে আমার কোন গর্ব নাই। আমিই সর্বশেষ নবী। আর এতদসম্পর্কে আমার কোন অহংকার নাই। আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোত্তালিব। আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাকে উহার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে বানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং আমাকে উহার উত্তম অংশে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে তিনি মানুষের মধ্যে গোত্র ও খান্দানের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাকে উহার শ্রেষ্ঠ খান্দান হইতে বানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি

মানুষের জন্য গৃহিণী তৈরী করিয়াছেন এবং আমাকে উত্তম গৃহিণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই, আমি যাত ও বংশ মর্যাদার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। কিয়ামতের দিন যখন লোকদিগকে উত্থিত করা হইবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর হইতে নির্গত হইব। যখন মানুষেরা হকতায়ালার দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে গমন করিবে, তখন আমি তাহাদের নেতা হইব। যখন তাহারা সকলেই নিশ্চুপ থাকিবে, তখন আমি একমাত্র বক্তা হইব। যখন তাহাদের সুপারিশ প্রত্যাখ্যাত হইবে, তখন কেবলমাত্র আমারই সুপারিশ কবুল করা হইবে। আর যখন তাহারা নিরাশ হইবে, তখন আমিই তাহাদের সুসংবাদদাতা হইব। সম্মান, বুজর্গী এবং নাজাতের চাবিকাঠি সেদিন আমার হাতেই থাকিবে। হামদের (প্রশংসার) ঝাণ্ডা সেদিন আমার হাতেই থাকিবে। আওলাদে আদমের মধ্যে আমিই সব চাইতে সম্মানীয় হইব। আমার চতুর্দিকে সেদিন এক হাজার খাদিম ঘোরাফেরা করিতে থাকিবে, যাহারা উজ্জ্বল মোতির ন্যায় হইবে। আর কিয়ামতের দিন আমিই সমস্ত আম্বিয়াদের ইমাম, তাঁহাদের বক্তা এবং শাফায়াতের অধিকারী হইব। আর এ ব্যাপারে আমার কোন গর্ব নাই। বস্তুতঃ তিনি সৃষ্টি না হইলে, হক সুবহানুহু তায়ালা না সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করিতেন, আর না তিনি তাঁহার রবুবিয়াত প্রকাশ করিতেন। আর তিনি সেই সময়ও নবী ছিলেন, যখন হজরত আদম আ. মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন, তাই কোন কবি বলেনঃ

নোমানদ্ বে-ইস্য়ান কাসে দর গোরোও–
কে– দারাদ্ চুনী সাইয়্যেদ পেশ্ রোও,
অর্থাৎ থাকিবে সে কতদিন গোনাহের ভিতর
মুহাম্মদ মোস্তফা স. হন, যার রাহবর।

<u>বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্টতা সম্পর্কেঃ</u> বস্তুতঃ এই উজ্জ্বল শরীয়তের মালিক রসুলে আনোয়ার সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকারকারী, এবং এই পবিত্র ও সম্মানিত মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধবাদীরা সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার বাণী- 'আল আরাবু আশাদ্দু কুফরান ওয়া নিফাকান' অর্থাৎ বেদুইন আরবেরা কুফর ও মুনাফেকীর দিক দিয়া অত্যন্ত কঠোর। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কিছু অনভিজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ দরবেশ যাহারা নিজেদের খেয়ালী

কাশফকে গ্রহণীয় বলিয়া ধারণা করে, তাহারা এই উজ্জ্বল শরীয়তের বিরোধিতা এবং অস্বীকারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অপরপক্ষে অবস্থা এই যে, হজরত মুসা আলায়হিস সালাম, যিনি আল্লাহ্‌র কালিমা এবং বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন তবে তিনিও এই শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করিতেন না। এমতাবস্থায়, এই বেচারা ফকীরদের এত দুঃসাহস কিসে যে, তাহারা তাঁহার স. বিরোধিতা করে? উহা ইহা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তাহারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ইলহাদ ও যিন্দিকের গুণে বিভূষিত হয়। আরো অধিক আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কিছু জ্ঞানী গুণী, বিজ্ঞলোকেরা ইহাদের অনুসরণ করে। ইহারা আদৌ শরীয়তের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, এবং বাহ্যত ক্ষতি সত্ত্বেও উহাদিগকে পূর্ণতাপ্রদানকারী হিসেবে মনে করে অথবা তাহাদের দৃষ্টিতে এই কথা, যাহা তাহারা বলে, আদৌ শরীয়তবিরোধী হিসেবে বিবেচিত হয় না। ইহাদের সম্পর্কে বাণী- 'আফামান যুয়্যিনালাহু সুই আমালিহি ফা-রআহু হাসানান' অর্থাৎ আর যাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের অপকর্ম, সুন্দররূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং তাহারা উহাকে সুন্দর মনে করে; তবে কি উহা উত্তম হইয়া যাইবে। অথবা তাহারা উহাদের কথাকে শরীয়তবিরোধী হিসাবে মনে করে, কিন্তু এইরূপ খেয়াল করে যে, হাকীকত হইল; শরীয়তের বিপরীত। আর এই ধরনের বক্তব্য ইলহাদ ও যিন্দীকের অনুরূপ। কেননা, ঐ সমস্ত, যাহা শরীয়তের খেলাফ, উহা খোদাদ্রোহীতারই অন্তর্ভুক্ত।

এই ফকীর ঐ জামাতের কিছু কিছু কাশফী আকায়েদের আলোচনা করিতেছে। এখন ইনসাফ করা দরকার যে, সত্যিই কি উহা শরীয়তের বিপরীত, যাহা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না, অথবা আদৌ উহা শরীয়তের বিপরীত নয়। এই জামাতের শায়েখ এবং নেতা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন- মানুষের রূহ্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে হক তায়ালার আয়নে যাতে অনুরূপ আর তাহারা দলিল স্বরূপ কোরআনের এই দুইটি আয়াত পেশ করেন ঃ

(১) ওয়া জাআ রাব্বুকা ওয়াল মালাকু সাফফান সাফফান। অর্থাৎ আর তোমার রব আসিবে এবং ফিরিশতা আসিবে কাতারবদ্ধ হইয়া (৮৯ঃ২১)।

(২) ইয়াওমা ইয়াকুমুর রূহু ওয়াল মালায়িকাতু সাফফান অর্থাৎ যেদিন রূহ্ খাড়া হইবে এবং ফিরিশতা কাতারবদ্ধ হইবে (৭৮ঃ৩৮)। ইহাদের উদ্ধৃত একটি আয়াতে ফিরিশতাদের সহিত রবের আসার কথা বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে রূহের আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই, রব এবং রূহ একই জিনিস

হইবে। আর এই সম্মিলন তওহীদে ওজুদীর অংশ নয়। কেননা, আল্লাহতো রূহের সাথে বিশিষ্ট নন, বরং সমস্ত সৃষ্টিজগত উহার সমঅংশীদার। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় স্থানে উল্লেখ আছে, আবদালদের কিছু লোক, যাহারা গুহায় বসবাস করেন, ইহাদের সংখ্যা হইল সর্বমোট সত্তর জন। ইহারা কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহারা মৃত্যুবরণ করিবেন না এবং ইহারা স্বাভাবিক অস্তিত্বের অধিকারী। তাহাদের এই কথা কোরআনের আয়াতের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ্তায়ালার ঘোষণা- 'কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাওতি' অর্থাৎ প্রত্যেক নাফসই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। অন্য স্থানে তাহারা আখিরাত সম্পর্কে বলিয়াছেন, মাবদা (শুরু) হইতে মাআদ্ (শেষ) পর্যন্ত মাত্র দুই 'আলম'– যাহা হইল দুনিয়া এবং আখিরাত। আর দুইটি আলমের প্রত্যেকটি ছয়বার বিন্যাস করা হইয়াছে, যাহা দুনিয়াতে অবতরণ এবং আখিরাতের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। আর তাহারা উন্নতির বিন্যাসকে, এইরূপে বর্ণনা করেন- যমীন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উহার অংশ পানিতে রূপান্তরিত হইবে এবং ইহার পরে সমস্ত মাখলুকাত পানিতে ডুবিয়া যাইবে। আর এই শরীয়তের মালিকেরা আরো বলেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকাত ঘর্মের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। এই স্থানে ঘর্মের অর্থ এই তুফান। সেই সময় হইবে তরক্কীর (উন্নতির) সময় এবং সকলেই একক যাত, রব্বুল ইয্যাতের দরবারের প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ্ হইবে। কিন্তু সেই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব মর্যাদা অনুযায়ী, বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইবে। আর সমস্ত মাখলুক তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। যেমন (১) সাবেকীন (অগ্রগামী দল) (২) আসহাবে-ইয়ামীন (ডানপন্থী) এবং (৩) আসহাবে শিমাল্ (বামপন্থী)।

অতঃপর তাহারা আরো উল্লেখ করেন যে, পানি যাহা আগুনের উত্তাপে পরিণত হইবে উহা শুকাইয়া যাইবে এবং সমস্ত কিছুই বাতাসে পরিণত হইবে। আর কিয়ামতের বিভীষিকার অর্থ হইল যে, অধিকাংশ সৃষ্টি তৃষ্ণার্ত ও পিপাসার্ত হইবে। অতঃপর ঐ বাতাসও অগ্নিমণ্ডলের প্রভাবে আগুনে পরিণত হইবে এবং সকলকে সেই আগুনের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। আর দোজখের অর্থ হইল, এই আলমে উনসুরী, যাহার সমস্ত কিছুই অগ্নিতে পরিণত হইবে। আর এই দোজখ অবস্থিত থাকিবে, চন্দ্রশোভিত আসমানের নিচে। দোজখের স্তরের মধ্যে, প্রত্যেক স্তরে স্ব স্ব আমল অনুপাতে, প্রত্যেক দল শাস্তিতে নিপতিত হইবে। অবশিষ্ট যাহারা এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবে, তাহারা নূরের জগতে অবস্থান করিবে। আর বিহেশতের অর্থ হইল এই 'আলমে নূর'। আর আসমানের প্রত্যেক স্তর,

আসমান হইতে, আরশের নিম্ন পর্যন্ত, আটটি আসমানের সমন্বয়ে হইবে। কাজেই বিহেশত আটটিই হইবে। কিছু লোক এই স্তরে বসবাস করিবে এবং উহার আরাম আয়েশে রাজী ও খুশী হইবে এবং উহা তাহাদের আমল অনুপাতে হইবে। আর কিছু লোক যাহারা সম্মানিত নবী এবং আউলীয়াদের পর্যায়ের হইবে, ইহারা এই স্তরও অতিক্রম করিয়া যাইবে এবং দীদারে ইলাহীর দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হইবে এবং মিলনের অপেক্ষায় থাকিবে। ইহাদের উপর না আগুনের কোন উষ্ণতার চিহ্ন থাকিবে, আর না শান্তির কোন প্রভাব থাকিবে। বরং ইহারা আল্লাহ্ তায়ালার দীদারে ভরপুর থাকিবে। আর তাহাদের স্থান হইবে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে)। আর ইহার দলীল স্বরূপ তাহারা কুরআনের এই আয়াত উল্লেখ করেন-

ফা-কানা কাবা কাওসায়নে আও আদনা অর্থাৎ অতঃপর পার্থক্য ছিল দুইটি ধনুকের মত, অথবা ইহা হইতেও নিকটতর (৫৩ঃ৯)। আর এই স্থানটি হইবে আরশের উপর। বস্তুতঃ ইহাদের শানেই নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে- ইন্না লিল্লাহি তায়ালা জান্নাতুন, লায়সা ফি-হা হুরুন অলা কুসুরুন ওয়া ফী হায়াতা জাল্লা রাব্বুনা দাহিকান্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার একটি জান্নাত এইরূপও আছে যে, যেখানে কোন হুর হইবে না, আর কোন প্রাসাদ থাকিবে না। বরং সেখানে আমাদের রব প্রসন্ন অবস্থায় তাজাল্লী ফরমাইবেন।

বস্তুতঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যাহার সামান্যতম বিভেদ জ্ঞান আছে, তাহার নিকট ইহা অজ্ঞাত নয় যে, উপরোক্ত যাবতীয় বর্ণনা শরীয়তের বরখেলাপ। তাহারা দোজখকে একটি অগ্নিমণ্ডল হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছে এবং যমীন, পানি ও বাতাসকে উহার মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। তাহারা বিহেশতের দ্বারা আলমে নূরের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, যাহা চন্দ্রশোভিত আকাশ হইতে আরশের নিম্ন পর্যন্ত হইবে। আর তাহার আম্বিয়া ও আওলীয়াদের স্থান আরশের উপরে নির্ধারণ করিয়াছে। বিহেশতে নয়। এই সমস্ত বর্ণনাই শরীয়তের স্পষ্ট খেলাফ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অভিমত এই যে, দোজখ এবং বিহেশত এখনও মওজুদ আছে। আর আম্বিয়া, আওলীয়া এই সমস্ত মুমিনগণ স্ব স্ব মর্যাদা অনুযায়ী জান্নাতে অবস্থান করিবেন। বস্তুতঃ এইরূপ নয় যে, তাহারা জান্নাত অতিক্রম করিয়া আরশের উপরে গমন করিবেন এবং সেখানেই অবস্থান করিবেন। এ সমস্তই কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র। ইহার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। বরং ইহাতে বিহেশতের মধ্যে দীদারে ইলাহীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হইয়াছে। কেননা, তাহারা বলিয়াছে যে, আরশের উপর গমনের পর দীদার

হইবে। আর তাহারা দীদারের জন্য আরশের উপর একটি আলাদা জান্নাত বানাইয়াছে, যেখানে না কোন হুর থাকিবে, আর না কোন প্রাসাদ । কাজেই, সাধারণ মুমিনগণ দীদারে ইলাহী হইতে মাহরুম থাকিবে। আল্লাহ্ সুবহানুহু তায়ালা আমাদিগকে এই ধরনের বাতিল ও বিভ্রান্তিকর ধারণা হইতে রক্ষা করুন।

মাকামে মাহমুদকে, যাহা প্রকৃতপক্ষে হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস এবং একইভাবে "আও-আদনা" বা আরো নিকটতর এই মাকামটিতেও ঐ ব্যক্তিটি, সমস্ত আম্বিয়া ও আওলীয়াদের জন্য অংশ আছে হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা একটি মিথ্যা অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তাহাদের উপরোক্ত আলোচনায় ইহাও জানা যায় যে, তাহারা কাফিরদের আযাবকেও চিরস্থায়ী হিসাবে মনে করে না। একইরূপে তাহারা জান্নাতের আরাম ও আয়েশকে অনন্ত মনে করে না। আর ইহা প্রকাশ্য কুফরী ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাহেবে ফুসূস[১] চিরস্থায়ী আযাব সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি এ কারণেই সমস্ত মাখলুকের নিকট কলঙ্কিত বা অভিশপ্ত হইয়াছেন। আর এই ধরনের লোকেরা কেনই বা অভিশপ্ত হইবে না, যাহারা চিরস্থায়ী আযাবকে অস্বীকার করে?

সবশেষে তাহারা লিখিয়াছে যে, 'হায়ের' হু অক্ষরের গভীর কুয়া হইতে, যাতে আহদীয়াতের একক জাতের জানালা দিয়া, তাহাদের উপর আফতাবে যাত (যাতের সূর্য) চমকাইতে থাকিবে; তখন প্রথম ও পরের সমস্ত মাখলুক অর্থাৎ যাহারা দোজখের আগুনের মধ্যে থাকিবে এবং যাহারা নূরের মধ্যে অবস্থান করিবে এবং যাহারা মাকামে মাহমুদে থাকিবে, সকলেই এই সৌন্দর্যে বিভোর হইবে এবং লাহুতের[২] দরিয়ায় ফানা হইয়া যাইবে। তখন বিহিশতের কোন চিহ্ন এবং দোজখের কোন শাস্তি সেখানে থাকিবে না। এই স্থানে কোনরূপ অশান্তি, হয়রানী, পেরেনশানী অপেক্ষা-এমন কি যেন্দেগী ও মওত থাকিবে না। কেননা, সব কিছুই যাতে রূপান্তরিত হইবে। যেমন ইহা ছিল সৃষ্টির আদিতে, তদ্রূপ অন্তেও হইবে। অতঃপর ঐ দুইটি 'আলম' অর্থাৎ প্রথমটি নূরের জগত, যেখানে বিহেশতের স্তর

---

১. ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থের প্রণেতা, শেখ মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী;

২. আল্লাহ্র প্রকৃতি— সূফীদের কাহারো মতে সেই স্তর যেখানে পৌঁছিলে সাধকের সত্তা, আল্লাহ্র প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়;

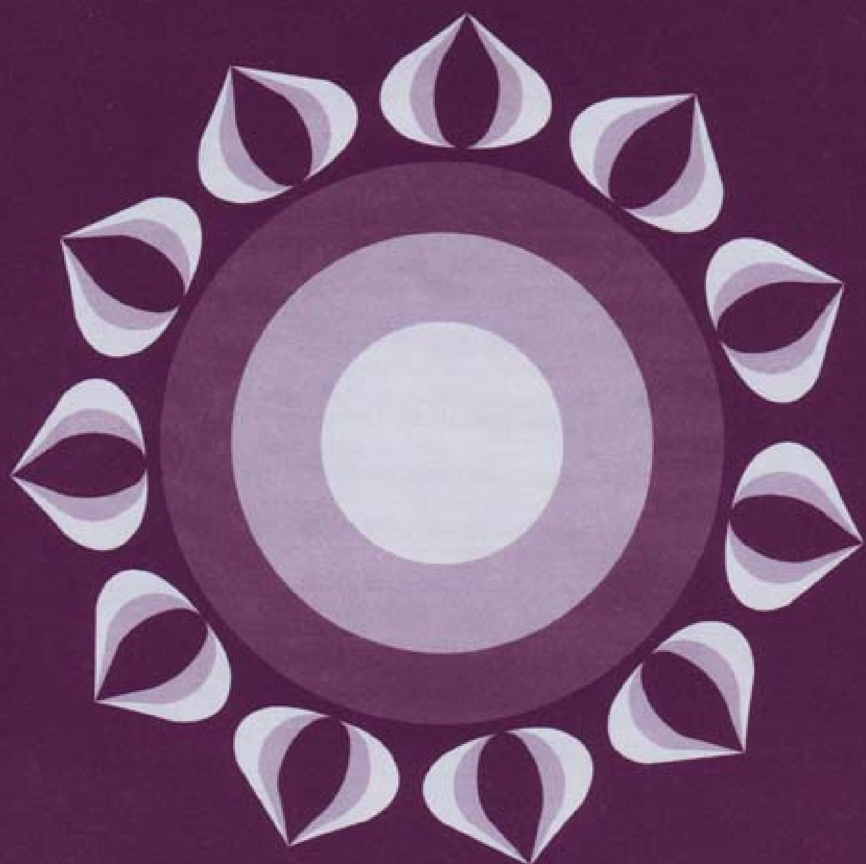
এবং দ্বিতীয়টি আগুনের জগত, যেখানে দোজখের স্তর, জামাল (সৌন্দর্য) ও জালালের (মহত্বের) তাজাল্লীতে প্রকাশ পাইবে। কেননা, সৃষ্টির প্রথম দিকে উহারা, এই দুইটি সিফাতের তাজাল্লীর দ্বারা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেখানে ইহারা বিল ইমকান (সম্ভাব্য) ছিল এবং এই স্থানে বিলওজুব (নিশ্চিত) হইবে। বিহেশতবাসীগণ স্ব স্ব মর্যাদা অনুসারে বসবাস করিবে এবং সব সময়ই সেখানে অবস্থান করিবে। আর দোজখের অধিবাসীরা স্ব স্ব অবস্থানে সদা সর্বদা পর্দার অন্ত রালে থাকিবে। এই দুইটি তাজাল্লী ব্যতীত, আর কোন তাজাল্লী গ্রহণীয় নয়। আর যাতও কোন কিছুর সহিত সম্পর্কিত নয়। (সমাপ্ত)।

উপরোক্ত আলোচনাতে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বিহেশত এবং দোজখ, যদিও ইহারা আখিরাতের অন্তর্ভুক্ত, ফানা হইয়া যাইবে। চিন্তা করা প্রয়োজন, এই ধরনের উক্তি কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায় কিনা? উহাদের বিনাশের পরে যে প্রকাশ ঘটিবে, ঐ প্রকাশকে তাহারা বিল ওজুব ধারণা করে। বস্তুতঃ দুনিয়ার প্রকাশকে বিল ইমকান ধারণা করা উচিত। আর আহলে বিহেশত ও আহলে দোজখকে ওয়াজিব বলা কুফরী নয় কি? উপরোক্ত আলোচনায় ইহাও জানা যায় যে, আম্বীয়া এবং আওলীয়াগণ সদাসর্বদা যাতে আহদীয়াতের মধ্যে বিলীন ও মিশ্রিত হইয়া থাকিবে এবং তাহারা কোনসময়ই অস্তিত্ব লাভ করিবে না। এইরূপ ধারণাও স্পষ্ট কুফরী বৈ কিছুই নয়।

বস্তুতঃ আম্বীয়া আ. এবং আওলীয়ারা সদাসর্বদা বিলীন ও অস্তিত্বহীন হওয়া ব্যতিরেকে, বিহিশতে অবস্থান করিবে। কিন্তু তাহাদের আলোচনাতে জানা যায় যে, আম্বীয়াগণ সাবেকীনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সাবেকীনরা আরশের উপর অবস্থান করিবে; যেখানে হুর, প্রাসাদ ও আরাম আয়েশের কোন উপকরণ থাকিবে না। এইরূপ বক্তব্যও স্পষ্ট দলিলের বিপরীত। কেননা, হক-সুবহানুহু তায়ালা সাবেকিনদের জন্য আরাম আয়েশের উপকরণ ও আয়তলোচনা (বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট) হুর সৃষ্টি করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের এই বক্তব্য পবিত্র কুরআনের বিপরীত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ব্যক্তিটি (ইবনুল আরাবী), ঐ সমস্ত নিয়ামত, যাহা সাবেকীনদের জন্য কুরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে, কেবলমাত্র আহলে ইয়ামীনদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। যেমন, কুরআনের ভাষায়- 'আলা সুরুরিম মাওদুনাতিন মুত্তাকিইনা তালায়হা মুতাকাবেলীন' অর্থাৎ তাহারা মণিমুক্তখচিত সিংহাসনের উপর হেলান দিয়া মুখোমুখি বসিয়া থাকিবে (৫৬ঃ১৬)। এই আয়াতটি সাবেকীনদের সম্পর্কীয়। কিন্তু এই ব্যক্তিটি, উক্ত আয়াতটিকে আহলে ইয়ামীনদের

জন্য বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা, এই ব্যক্তিটি, কোরআন মযীদ সম্পর্কে বিলকুল জাহিল। তিনি তাহার কিতাবে আরো বর্ণনা করিয়াছেন যে, তওহীদে ওজুদীতে তিনি শায়েখ আত্তার র. এবং মাওলানা রুমীর র. অনুসারী। এতদসত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন, ইহারা শয়তান হইয়া গিয়াছে। (আল্লাহ্ পানাহ)! আমি এইরূপ কটুক্তি হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হক-সুবহানুহু তায়ালাকে এইরূপ শব্দের দ্বারা স্মরণ করা খুবই অন্যায় এবং কুফরী। আরবাবে তওহীদ যদিও "হামা উস্ত" বলেন, তথাপিও তাহারা এই ধরনের কটুক্তি করাকে বৈধ মনে করেন না। তাহারা শরীয়তের দৃষ্টিতে হক-সুবহানুহু তায়ালাকে "সব কিছুরই সৃষ্টিকারী" বলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু সৃষ্টিকারী" বলাকে জায়েয মনে করেন না। তাহার বক্তব্যের মধ্যে এই ধরনের বহু উক্তি আছে। যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে উহা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু এই সামান্য আলোচনাতেও উহা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাই কোন কবির ভাষায়- সালেকে নাকুস্ত আয্ বাহারাশ্ পয়দাস্ত,

অর্থাৎ সেই বৎসরই উত্তম, যাহার বসন্ত অতি উত্তম। এই ফকীর, এই গ্রন্থের মধ্যে তাহার কয়েকটি বেহুদা বক্তব্যের বর্ণনা দিয়াছে, যাহাতে লোকেরা তাহার অপকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। আর তাহার অনুসরণ করিয়া যাহাতে নাস্তিকদের দলভুক্ত না হয়। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ এই জামাতের অনুসরণ করে, তবে তজ্জন্য সে দায়ী থাকিবে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর সর্বকালীন শান্তি এবং রহমত ও তাঁহাদের প্রতি সালাম যাঁহারা হেদায়েতের অনুসারী। (আমিন। ছুম্মা আমিন)।



হাকিমাবাদ
খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ISBN
984-70240-0022-4